ফেরারী অতীত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

BENGALI EBOOK

2021

সূচিপত্র

ক্ষুধা....................2
ফেরারী অতীত....................31
বাঘিনীর নিঃশব্দ গর্জন....................47
মধুরঙ্গ....................74
রূপ....................85

ক্ষুধা

ট্রেনে সাধারণত থার্ড ক্লাসের খদ্দের আমি। স্লিপার কোচে সাড়ে চার টাকার বাড়তি মাশুল গুনে রাতে ঘুমোবার জন্যে একখানা বেঞ্চ পেলেই খুশি। ফলে অভ্যেসখানা এমন হয়েছে যে, বরাতজোরে সদ্য বর্তমানে ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ কোচের চারজনের বিচ্ছিন্ন কম্পার্টমেন্টে এত আরামের জায়গা পেয়েও ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ বাদেই ভেতরটা ওই থার্ড ক্লাসের জন্যেই আনচান করে উঠেছিল। অথচ একটু আগে এই অভিজাত খুপরিতে পদার্পণ করে এবং আসন নিয়ে ভেতরটা প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। পরিষ্কার চকচকে কামরা, দুদিকে দুটো পুরু গদিআঁটা বার্থ, আর ওপরে তেমনি গদিআঁটা আরো দুটো বার্থ। বেশ চওড়া। শুলে পিঠের সিকিভাগ বেরিয়ে থাকার সম্ভাবনা নেই। মাথার ওপর চারজনের জন্যে চারটে পাখা, দুটো বড় সাদা লাইট, একটা সবুজ লাইট, শিয়রের দিকের ওপরে নাচে চার কোণে চারটে শেড-দেওয়া ছোট পড়ার লাইট-স্বাচ্ছন্দ্যের আরো কিছু আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা। সামনের দরজাটা টেনে দিলেই চারটি যাত্রী ট্রেনের মধ্যে থেকেও বিচ্ছিন্ন।

মোট কথা, এই শ্রেণীর যাত্রীদের মান এবং মর্যাদা সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষ কিছুটা সচেতন। তা যত গুড় তত মিষ্টি। এয়ার-কনডিশন আরো আরামের, এরোপ্লেনে ততোধিক, আর এই গুড় যদি নিজের পকেট থেকে ঢালতে না হয় তাহলে যাকে বলে মিষ্টি মধুর। এই যাত্রায় আমি চলেছি সম্মানিত অতিথি হিসেবে একজন সহযাত্রীর কাঁধে ভর করে যিনি পকেটের পরোয়া করেন না। ফলে আমার দিক থেকে এটি নির্ভেজাল আনন্দ-যাত্রা। আনন্দের আরো কিছু ফিরিস্তি দেওয়া যেতে পারে। কোন ভবঘুরের উক্তি, আপনার বেড়াবার আনন্দ অনেকখানি নির্ভর করছে আপনার সহযাত্রীর ওপরে। সহযাত্রী বা যাত্রীরা যদি স্বল্পভাষী অথচ রসিক হন তাহলে আপনি ভাগ্যবান, তিনি বা তারা যদি আপনার থেকে বাকপটু হন তাহলে আপনার ভাগ্যটা মাঝারি, আর যদি পলকা বাক্যবাগীশ হন তো আপনার দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একটি মাত্র যদি সুদর্শনা রমণী থাকেন আর তিনি যদি সহযাত্রীর ওপর হাবভাবেও সামান্য একটু সহৃদয়া হন আর অল্পসল্প মিষ্টি

হাসেন আর একটু-আধটু কথা বলেন তো আপনার ভাগ্যের তুলনা নেই– পথ যত দীর্ঘ বা ক্লান্তিকর হোক, আপনার ভিতরটা রংদার তাজা ফড়িংয়ের মত আনন্দের ডালে ডালে ঘুরেফিরে বেড়াবে।

তা আমি এ-যাত্রায় প্রায় সব দিক থেকেই তুলনারহিত ভাগ্যবান। চার বার্থের এই অভিজাত কম্পার্টমেন্টে আমাকে বাদ দিলে আর দুজন সহযাত্রী এবং একজন সহযাত্রিনী। ভদ্রলোক দুজনের একজনের বয়েস পঁয়তাল্লিশ একজনের বড়জোর পঁয়ত্রিশ। তারা মামাতো-পিসতুতো ভাই। এ-যাত্রায় ওই পঁয়তাল্লিশ, ভদ্রলোকটির গৌরী সেনের ভূমিকা। নাম তার যাই হোক, সকলে মজুমদার মশাই বা বড়বাবু বলে ডেকে থাকে। বাংলা ছায়াছবির মোটামুটি নামী প্রযোজক অর্থাৎ প্রোডিউসার তিনি। এতদিন নিতান্ত মাঝারি প্রোডিউসার ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি পর পর তার দুখানা ছবি ঊর্ধ্ব মার্গের বক্স অফিস হাট। সেই বিত্তের হিড়িকে রাতারাতি বৃত্ত বদল হয়ে গেছে তার। প্রযোজনার সামনের সারিতে এসে হাজির হয়েছেন। সেই দুখানা ছবিই রিলিজের পর পর আমি দেখে নিয়েছিলাম এবং আশাহত হয়েছিলাম। খরচের টাকা উশুল হবে কিনা সংশয় ছিল। কিন্তু সব সংশয় বরবাদ করে ভদ্রলোক প্রমাণ করেছেন বাংলা ছবির দর্শক-মনের কত নির্ভুল বিচারক তিনি। দুবছরে পর পর দুখানা ছবি। তাক লাগানো ভাবে লাগিয়ে দিয়ে এখন সাদা আর কালো টাকার হিসেব-নিকেশে মশগুল হয়ে আছেন। এবারে তার, যাকে বলে একখানা প্রেস্টিজ ছবি করার বাসনা। কিন্তু প্রযোজকের শুধু প্রেস্টিজ ধুয়ে জল খেলে চলে না। কাগজওয়ালারা গত দুটো হট ছবির একটিরও সদয় মন্তব্য করেনি। অতএব এবার নাম চাই আর সেই সঙ্গে টাকাও চাই।

অনেক খেটে অনেক জল্পনা-কল্পনা করে এই প্রেস্টিজ ছবির যে গল্প বাছাই করা হয়েছে, ভাগ্যক্রমে সেটা আমারই লেখা। সত্য কথা বলতে কি, আমি নিজেই একটু অবাক হয়ে গেছলাম। আগের ওই সুপারহট পিকচার যারা করেছেন তাদের কেউ এ গল্পের ছায়া মাড়াতে পারেন, ভাবিনি। কিন্তু আমার ভাবনা নিয়ে তো আর জগৎ চলছে না, আর বলা বাহুল্য, এই ব্যতিক্রমের ফলে অন্তত ভদ্রলোকের সম্পর্কে ধারণা অনেকখানি বদলেছে। এখন আমার ধারণা, টাকা কি করে করতে হয় ভদ্রলোক

জানেন, সেই সঙ্গে ভালো-মন্দের বিচার-বোধও আছে। ব্যবসায়ী হিসাবে গল্পের দাম নিয়ে প্রথম দফায় কিছু ঝকাঝকি করেছেন আমার সঙ্গে, ফয়সলা হয়ে যাবার পর তিনি ভিন্ন মানুষ।

দিলদরিয়া অতিথি-বৎসল। গল্পের আলোচনার জন্য বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে। অনেক খাইয়েছেন। এই ছবিতে নিযুক্ত নামী পরিচালকটির কাছে নিজের বক্তব্য শেষ করার জন্য আমাকে ঠেলে দিয়েছেন। লক্ষ্ণৌতে আউটডোর শুটিং-এ চলেছেন। এঁরা। ইউনিট নিয়ে পরিচালক দুদিন আগেই যাত্রা করেছেন। মজুমদার মশাই, অন্যথায় বড়বাবু, ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে আটকে পড়েছিলেন বলে দুদিন পরে যাচ্ছেন। বড়বাবুর সর্বকাজের প্রধান দোসর তার এই পিসতুতো ভাই হিরন্ময় বা হিরু গুপ্ত। বড়বাবু না নড়লে তারও নড়ার উপায় নেই। অতএব ম্যানেজারির ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে সে-ও দুদিনের জন্য পিছিয়ে গেছে। আমার সঙ্গী হবার বাসনাটা সে-ই বড়বাবুকে জানিয়েছিল, শোনামাত্র ভদ্রলোক আমাকে দরাজ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

এ-হেন সহযাত্রী আর যাই হোক অবাঞ্ছিত নন। তাছাড়া ভদ্রলোক কথা বেশি বলেন না, তার থেকে ঢের বেশি মিটিমিটি হাসেন। তখন তার খুশি-খুশি ফোলা গাল দুটোকে টসটসে রসালো মনে হয়। লক্ষ্য করেছি তার কথায় সোজা সায় দিলে তিনি সেটা চাটুকারিতা ভাবেন, কিন্তু প্রতিবাদ করে শেষে যুক্তি খুঁজে না পেয়ে হার মানলে তুষ্ট হন। হিরু গুপ্তের আচরণে এই বৈশিষ্ট্যটুকুই লক্ষ্য করেছি। প্রতি কথায় প্রথমে বাধা দিয়ে পরে স্বীকার করবে, তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমি আগে বুঝিনি, বা এদিকটা খেয়াল করিনি, ইত্যাদি।

পাঠানকোট সকালে ছাড়ে, পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় লক্ষ্ণৌ পৌঁছায়। অতএব আমাদের গোছগাছ নিয়ে তাড়ার কিছু ছিল না। কিন্তু গাড়িটা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মজুমদার মশাই উঠে দাঁড়িয়ে বার্থগুলো একনজর দেখে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ওপরে না নীচে?

আমি জবাব দেবার আগেই হিরু গুপ্ত মন্তব্য করেছে, ওনার নীচের বার্থ হলেই সুবিধে হয় বোধহয়, কিন্তু…

কিন্তুর দিকে না গিয়ে তাড়াতাড়ি বলেছি, না না, ওপরের বার্থে আমার একটুও অসুবিধে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে সামনের মহিলার দিকে চোখ গেছে। তার নির্লিপ্ত মুখভাব। নীচের আর একখানা বার্থ তার দখলে থাকবে জানা কথাই।

মৃদু হেসে মজুমদার মশাই নিজের হাতে আমার বেডিং খুলতে গেলেন। তার উদ্দেশ্য বোঝার আগেই হিরু গুপ্ত হাঁ-হাঁ করে উঠল, আহা, ওঁর বিছানা পরে করে দেওয়া যাবে- সর্বব্যাপারে তোমার ব্যস্ততা

পরে নয় এখনই করে দে তাহলে। আর ওই বার্থে তোরটাও পেতে ফেল – সবকিছু পরিপাটি ছিমছাম না হলে আমার অস্বস্তি।

আমি কিছু বলার ফুরসুত পেলাম না। হিরু গুপ্ত অপ্রসন্ন মুখে আমার হোলড অলটা টান মেরে খুলে ফেলল। অতএব ব্যস্ত হয়ে আমিও তার সঙ্গে হাত লাগালাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমার ফিটফাট শয্যা রচনা হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় বাংকে সে নিজের তকতকে শয্যা বিছালো, তারপর নেমে এসে বলল, এবার তোমাদেরটাও শেষ করে যে যার শুয়ে পড়া যাক।

অল্প হেসে মজুমদার মশাই বললেন, আমাদেরটা এখন কি, বসতে হবে, খাওয়া দাওয়া সারতে হবে

বলতে বলতে ঝুঁকে বড় ট্রাংকটা খুলে দুটো ঝকমকে গালচে বার করলেন।–নীচে আপাতত এই দুটো বিছিয়ে দে।

নীচের গদি-আঁটা বেঞ্চদুটোয় শৌখিন গালচে বিছানো হল। এ ব্যাপারে দেওরের সঙ্গে মহিলা নিজেও হাত লাগালো। তারপর জিনিসপত্রগুলোও জায়গামত গোছগাছ করে রাখল। এই সামান্য কাজটুকু দেখেই আমার কেমন মনে হল, মহিলার রুচিবোধ আছে। তাছাড়া ওপরে বিছানাপত্র

সুবিন্যস্ত করা আর নীচে গালচে দুটো পেতে অন্য। জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখার পরে ছোট কামরাটার শ্রীই বদলে গেল। ধপ করে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ে ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে হিরু গুপ্ত মন্তব্য করল, সত্যিই এখন ভালই তো লাগছে দেখি।

তোষামোদটুকু যার উদ্দেশ্যে তিনি অর্থাৎ মজুমদার মশাই সেটা স্মিতহাস্যে গ্রহণ। করে আমার দিকে ফিরলেন।–বসুন, এখন কি খাবেন বলুন?

এবারও হিরু গুপ্ত আগেই তড়বড় করে উঠল, এই তো খেয়ে বেরুনো হল সবে, এখনই আবার খাওয়া কি!

আমিও সায় দিলাম, যাক খানিকক্ষণ।

মজুমদার মশাই স্ত্রীর উল্টোদিকের আসনে গা ছেড়ে দিয়ে বসলেন। ঠোঁটের ফাঁকের হাসির অর্থ–দেখা যাক কতক্ষণ কাটে।

এবারে দ্বিতীয় সহযাত্রী হিরু গুপ্তর প্রসঙ্গ। আধময়লা লম্বাটে চেহারা। নাকের ডগা একটু থ্যাবড়া, চোখ দুটো মন্দ নয়, কিন্তু চাউনিটা বেশ প্রখর। এ চোখের দিকে তাকালে মনে হয় ওর মাথার মধ্যে সর্বদাই কিছু একটা জল্পনা-কল্পনা চলছে, সেই কারণে ওর মনটা যথার্থ স্থানে যেন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নয়। ফলে চাউনির মধ্যে এক ধরনের ধারালো সংশয়ের ছায়া।

সহযাত্রী হিসেবেও একে কোন শ্রেণীতে ফেলব বলা শক্ত। কারণ কথা যখন বলে অনর্গল বলে যেতে পারে। আবার যখন চুপ করে থাকল একেবারে চুপ। হাবভাব ছটফটে গোছের। আজ নয়, আগেও মনে হয়েছে ওর ভিতরে কিছু একটা অসহিষ্ণুতা দানা বেঁধে আছে। সেই ঝোঁকে চলে, সেই ঝোঁকে কথা বলে। বড়বাবুর সে ডান হাত, ইউনিটে স্বভাবতই তার অখণ্ড প্রতাপ।

আমার সঙ্গে এর প্রথম আলাপ ছবির এই গল্প নিয়েই। এ গল্প নির্বাচনের ব্যাপারে সে-ই যে প্রথম উদ্যোক্তা এটা সে গোড়াতেই আমার কাছে জোর গলায় জাহির করেছে, দাদা কি সহজে বুঝতে চায় মশাই, নাকি এসব হাই

জিনিস সহজে তার মগজে ঢোকে। ঠেসে ঢোকাতে হয়েছে মশাই, বুঝলেন? এ-জন্য ডিরেক্টরকে পর্যন্ত আগেভাগে হাত করতে হয়েছে। গল্প পড়ে তিনি টলতে দাদা ঢলল। গল্পটা ভাল করে মাথায় ঢোকার পরে অবশ্য দাদার উৎসাহ সকলকে ছাড়িয়েছে। আমার অবিশ্বাসের কারণ নেই, কারণ কি ছবি উনি আগে করেছেন দেখেছি। ভিতরে ভিতরে হিরু গুপ্তর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। দিনকয়েক বাড়িতে আসার ফলে বেশ খাতির হয়ে গেছল। সেই খাতির জমাট বেঁধে গেল কিছুদিন আগের এক সন্ধ্যায়। সেই সন্ধ্যায় বাড়িতে এর জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছিলাম। কারণ সেই দিন আমার এই ছবির গল্পের পুরো দাম অর্থাৎ বেশ কয়েক হাজার টাকা প্রাপ্তিযোগ আছে।

নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে হিরু গুপ্ত এলো। আশা করেছিলাম ফাইনাল লেনদেনের ব্যাপারে তার দাদাও আসবেন। কিন্তু গাড়ি থেকে হিরু গুপ্ত একাই নামল।

তার দিকে চেয়ে আমি অবাক একটু। শুকনো ক্লান্ত মুখ, উসকো-খুসকো চুল। এসেই টাকার বাণ্ডিল সামনে ফেলে দিয়ে রিসিট বার করে বলল, দেখে নিয়ে সই করে দিন

দেখে নেওয়া অর্থাৎ টাকা গুনে নেওয়া দরকার বোধ করলাম না। যারা দিচ্ছে দেখেশুনে গুনেই দিচ্ছে। রিসিটটা নাড়াচাড়া করতে করতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে ভালো দেখাচ্ছে না, অসুস্থ নাকি?

-না মশাই, এই লোহা-মার্কা শরীরে অসুখ-বিসুখ নেই–সেই সকাল থেকে আপনার এই ছবির ব্যাপারে ছোটাছুটি, তারপর তিনটে থেকে ছটা পর্যন্ত ইনকাম ট্যাক্স, সেখান থেকে ডিরেক্টরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেরে আপনার এখানে আসছি –সকাল থেকে চান দূরে থাক পেটে একটা দানা পড়েনি।

আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।সে কি! নিজে না এসে বাদাকে পাঠালেই তো পারতেন!

হাসল। হাসিটা কেমন তিক্ত মনে হল আমার। জবাব দিল, তিনি আজ ব্যস্ত বড়, তাঁর ব্যস্ততার সবটুকুই আনন্দের। নিন সই করুন চটপট

রিসিট রেখে টাকার বাণ্ডিল হাতে করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। সই পরে হবে, আপনি ঠাণ্ডা হয়ে বসুন, বিশ মিনিটের মধ্যেই আমি আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করছি।

এই আন্তরিকতার ফলে উল্টে কেউ যে বিরক্ত হতে পারে ধারণা ছিল না। হিরু গুপ্ত যথার্থই বিরক্ত। উঠে দাঁড়াল একেবারে।- দেখুন মশাই, আমার মেজাজপত্র এখন ভাল নয়, সই করবেন তো করুন, নইলে আমি চললাম, পরে সই করে পাঠিয়ে দেবেন।

মেজাজ দেখে সত্যিই বিব্রত বোধ করলাম একটু। বসে রিসিট সই করে দিলাম। সেটা দেবার ছলে তার হাত ধরে সকাতরে বললাম, দেখুন সমস্ত দিন উপোস করে আপনি টাকা দিতে এসে শুধু-মুখে ফিরে গেলে খুব খারাপ লাগবে, আপনি দশটা। মিনিট বসুন, আমি যা হোক কিছু ব্যবস্থা করছি।

বিরক্তি চাপতে চেষ্টা করে সোজা মুখের দিকে তাকালো। তারপর কি ভেবে থমকালো একটু।–খাওয়াতে চান?

–যা হোক একটু কিছু

–একটু কিছু কি খাওয়াবেন?

–একটু সময় দিলে যা খেতে চাইবেন তাই খাওয়াব।

হাতঘড়িটা দেখে নিল। সাড়ে সাতটা। আবার চোখে চোখ রেখে দুই এক পলক ভেবে নিল। তারপর কষ্ট করে হেসে বলল, সমস্ত দিন বাদে একটু কিছু খেয়ে আর কি হবে, আজ আপনার সুদিন, খাওয়াতে চান তো ভালো করেই খাওয়াবেন চলুন, আমি গাড়িতে বসছি, চটপট রেডি হয়ে আসুন।

আমি হতভম্ব একটু। হিরু গুপ্ত ততক্ষণে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে। অগত্যা। তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে জামাকাপড় বদলে নিলাম। কি খেতে চায় ভগবানই জানেন। নোটের বাণ্ডিল থেকে দুটো একশো টাকার নোট পকেটে ফেলে বেরিয়ে এলাম। স্ত্রী ততক্ষণে খুশিচিত্তে নোটের তাড়া নিয়ে গুনতে বসেছেন।– যা মনে হয়েছিল তাই। গাড়িতে পাঁচটা কথাও হল না, অভিজাত এলাকায় এসে যে ভোজনশালাটি বেছে নিল সেটি পানশালাও বটে। আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। হিরু গুপ্ত ড্রিংক-এর অর্ডার পেশ করল। আমার চলে না শুনে একটু যেন বিরক্ত। বেয়ারা চলে যেতে মন্তব্য করল, আপনি একেবারে জলো লেখক দেখি

নিঃশব্দে দুদফা গেলাস খালি করল। ইশারায় বয়কে আবার ঢেলে দিতে বলল। ইতিমধ্যে খাবার অর্ডারও সে-ই দিয়েছে। এতক্ষণে একটু একটু করে মেজাজ আসছে। মনে হল। মুখে সস্তা কড়া সিগারেট লেগেই আছে। ঘন ঘন সিগারেট খাওয়াটাও রোগ হিরু গুপ্তর। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, মদ কেন খাই বলুন তো?

-অভ্যেস করে ফেলেছেন!

-কেন অভ্যাস করতে গেলাম? ভালো জিনিস তো কিছু নয়। এই যে আমি একাই গিলে চলেছি, সামনে বসে আপনি খাচ্ছেন না–আপনার ওপর আমার রাগই হচ্ছে।

জবাব এড়াতে চেষ্টা করে বোকার মত একটু হাসলাম শুধু। চো করে হিরু গুপ্ত গ্লাসের অর্ধেক সাবাড় করল। সিগারেটের ডগায় নতুন সিগারেট ধরিয়ে বলল, আসলে যন্ত্রণা ডোবাবার এ একটা মোক্ষম দাওয়াই। আমিও খেতাম না, এখন এন্তার খাই। শালারা খাবার দিতে এত দেরি করেছ কেন? কি বলছিলাম, যন্ত্রণা! আপনি আমার। সঙ্গে পনেরো দিন এসব জায়গায় ঘুরুন, তারপর বাড়ি ফিরে একদিন দেখুন অন্য কোন লোকের সঙ্গে আপনার বউ পালিয়েছে বা সেই গোছের কিছু একটা হয়েছে। –তখন দেখবেন মদ আপনার একমাত্র বন্ধু। হেসে উঠল, এটা একটা কথার কথা, মানে উপমা

হিরু গুপ্ত এখন কথার মুড-এ আছে। আর এক চুমুকে গেলাস খালি করে হাঁক দিল, বোয়!

হন্তদন্ত হয়ে এসে বয় গেলাস বদলে সোডার বোতল খুলে সামনে রাখল। তার। দিকে চেয়ে হিরু গুপ্ত নৃশংস অথচ ঠাণ্ডা গলায় বলল, পাঁচ মিনিটমে টেবিল পর। খানা নহী আয়ে- তো

বাকিটুকু শেষ করে পাঁচ আঙুলে খোলা সোডার বোতলটা চেপে ধরল সে। এখানকার বয় সম্ভবত খদ্দেরের এই গোছের মেজাজ দেখে অভ্যস্ত। গলা দিয়ে জি সাব নির্গত করে চকিতে উধাও সে। হিরু গুপ্ত গেলাসে সোডা মেশালো। এইবার আমি আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়লাম। বললাম, আপনার যন্ত্রণাও মেয়েঘটিত নিশ্চয়ই!

গেলাস মুখে তুলতে গিয়েও তোলা হল না। হিরু গুপ্ত আকাশ থেকে পড়ল যেন একেবারে।–আমার যন্ত্রণার কথা আপনি জানলেন কি করে? আমি কিছু বলেছি?

নেশার ঘোরে আলোচনার প্রসঙ্গ এরই মধ্যে ভুলেছে মনে হল। আমার সুবিধেই হল, বললাম, আপনাকে দেখে কেন যেন আমার সেই রকমই মনে হয়।

–কি মনে হয়? উদগ্রীব।

–কোন মেয়ের কাছ থেকে আপনি বড় রকমের আঘাত পেয়েছেন।

থমথমে চোখে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর বড় করে এক ঢোক গিলে নিয়ে বলল, এই জন্যেই আপনারা লেখক, আপনারা জীবনশিল্পী–আপনার। সম্পর্কে আমার ধারণাই বদলে গেল।

অমায়িক একটু হেসে খাবারের প্রত্যাশায় আমি ঘাড় ফেরালাম। খাবার না আসা পর্যন্ত গেলাসের চাহিদা থামবে বলে মনে হয় না। খাওয়ার ফাঁকে হিরু গুপ্তর যন্ত্রণা প্রসঙ্গে পাড়ি দেবার ইচ্ছে।

গেলাস আধা-আধি খালি। সামনের দিকে ঝুঁকে সাগ্রহে সে এক ধরনের দার্শনিকতার মধ্যে ঢুকে পড়ল।–আপনি আজ টাকা পেলেন আপনার সুদিন, আর সমস্ত দিন উপোস আর ধকলের পর আপনাকে সেই টাকা দেবার জন্য ছুটতে হল বলে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছল। ওদিকে দেখুন, দাদার আজ সব থেকে আনন্দের দিন আর ওই এক কারণে আজই আমার সব থেকে খারাপ দিন। একই কারণে একজনের ভালো তো একজনের খারাপ–একজনের খারাপ তো একজনের ভালো! আশ্চর্য না?

সদয় মুখ করে মাথা নেড়ে সায় দিলাম।-আজকের দিনেই বোধহয় আপনি কাউকে খুইয়েছিলেন?

বেদনায় আর বিস্ময়ে হিরু গুপ্তের ভারী চোখ দুটো বিস্ফারিত।- আপনি তো অদ্ভুত মানুষ দেখি, আঁ! এমনিতে তো মনে হয়, ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানেন না! সাগ্রহে আরও সামনে ঝুঁকল, গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা।–কিন্তু এ যন্ত্রণার শেষ কোথায়? শেষ আছে?

–কি জানি!

–জানেন, জানেন–আপনি অনেক জানেন–বলুন।

ভেবে নিলাম একটু।–শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনার যন্ত্রণা যদি সত্যি হয়, তার একটা ভাগ তিনিও পাচ্ছেন।

নেশা ছোটার উপক্রম। লাফিয়ে উঠল যেন।–পাচ্ছেন? পাচ্ছেন? আপনি ঠিক জানেন?

ভারী গলায় জবাব দিলাম, তা নাহলে যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা থাকে না–বিস্বাদ হয়ে যায়।

কি বুঝল হিরু গুপ্ত সে-ই জানে। দুচোখ টান করে চেয়ে রইল।

খাবার এলো।

সেই খাবারের পরিমাণ দেখে আমার চক্ষুস্থির। এত অর্ডার দেওয়া হয়েছে কল্পনাও করিনি। প্রমাণ সাইজের টেবিলটায় হিরু গুপ্তর সোডার বোতল আর গেলাস রাখারও জায়গা নেই। এক চুমুকে সে গেলাসটা খালি করে দিল। টেবিল পরিষ্কার করে দুটো বয় আটটা বড় ডিসে একরাশ খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল।

হিরু গুপ্ত নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। ঘোর-লাগা দুই চোখ টান করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভোজ্যসামগ্রী একদফা নিরীক্ষণ করে নিল। তারপর কাঁটা-চামচে সব একধারে সরিয়ে রেখে হাত লাগালো। আমার উদ্দেশে অস্ফুট স্বরে বলল, শুরু করুন।

আমি শুরু করলাম কি করলাম না দেখার ফুরসত নেই। হিরু গুপ্ত ক্ষিপ্র মেজাজে খেতে লাগল। খাওয়ার ব্যাপারে এই গোছের তৎপর একাগ্রতা কমই দেখেছি। যেন অনেক দিন খেতে পায়নি। তার মধ্যে একরাশ খাবার হাতের কাছে পেয়ে হামহুম করে খেয়ে চলেছে। এই খাওয়ার ঝোঁক দেখে এতক্ষণ সে কোন রাজ্যে ছিল কল্পনাও করা যাবে না। মুখে কথা নেই, অবিরাম মুখ নড়ছে আর হাত নড়ছে। দুচোখ খাবারের ডিশগুলোর ওপরেই চক্কর খাচ্ছে। বলা বাহুল্য, মোট খাবারের চার ভাগের তিন ভাগই সে অক্লেশে উদরস্থ করল। এই খাওয়ার ফাঁকে দুই-একবার আমি পূর্ব প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু তার খাওয়ার তন্ময়তায় চিড় ধরানো গেল না।

একেবারে খাওয়া শেষ করে তবে মুখ তুলল। বড় একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, বেশ খেলাম, আপনার হয়েছে?

-অনেকক্ষণ।

–চলুন তাহলে ওঠা যাক।

বিল মিটিয়ে আবার তার গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। এখনো আশা করছিলাম হিরু গুপ্ত তার যন্ত্রণার প্রসঙ্গ তুলবে। কিন্তু সেটা ওই একরাশ খাবারের তলায় চাপা পড়ল কি আর কিছুর, ভেবে পেলাম না। কিন্তু যা-ই হোক, এই

www.bengaliebook.com

এক সন্ধ্যার পর থেকে হিরু গুপ্ত আমাকে একেবারে তার বুকের কাছের মানুষ ভাবে।

তৃতীয়, সহযাত্রিনী প্রসঙ্গ।

ভবঘুরের উক্তির সঙ্গে অনেকটা মেলে। রমণী শুধু সুদর্শনা নয়, সুলক্ষণাও। সুন্দর মুখে একধরনের চাপা মিষ্টি অভিব্যক্তি ছড়িয়ে আছে। মুখ তুলে সোজা মুখের দিকে তাকাতে পারে, কিন্তু চাউনিটা নরম আর ঠাণ্ডা গোছের। বয়েস বড়জোর তিরিশ, লম্বা গড়ন, স্বাস্থ্যও পরিমিত। নড়াচড়ার ফাঁকে নিজেকে একটু ঢেকেঢুকে রাখার সহজাত প্রবৃত্তিটুকুও মিষ্টি লাগল। পঁয়তাল্লিশ বছরের স্থূলবপু মজুমদার মশাইয়ের পাশে একটুও মানায় না। কিন্তু সংসারের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ-রকম বেমানান জটিই দেখা যায়। নাম শুনলাম মিলু। মজুমদার মশাই এর মধ্যে বারকয়েক তাকে ওই নামেই ডেকেছেন। সম্ভবত সংক্ষিপ্ত আদরের ডাক এটা।

এক্ষুণি খাওয়ার প্রসঙ্গ বাতিল করে হিরু গুপ্ত তার সস্ত কড়া ব্র্যাণ্ডের সিগারেট বার করে ঠোঁটে ঝোলালো। তার পরেই একটু থমকে রমণীর দিকে তাকালো। রমণীর ঈষৎ অপ্রসন্ন ঠাণ্ডা চাউনি লক্ষ্য করলাম আমিও। এটুকুও সুচারু মনে হল। ১৬২

ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে হিরু গুপ্ত বলে উঠল, যাচ্ছি বাবা, বাইরে যাচ্ছি। এই জন্যেই নিজের জন্য আলাদা কম্পার্টমেন্ট করতে চেয়েছিলাম, এখন পনেরো মিষ্টি অন্তর উঠে বাইরে গিয়ে সিগারেট খেয়ে আসতে হবে

গজগজ করতে করতে উঠে দাঁড়াল সে। মজুমদার মশাইয়ের হাসিতে হে। ঝরল–তোরই তো দোষ, এতদিনে সিগারেটের গন্ধটাও সহ্য করাতে পারলি না–

প্রোডিউসার দাদার মুখের ওপর বেশ জুতসই সরস জবাব দিতে পারে দেখলাম হিরু গুপ্ত। বলল, দখলদার তুমি, আর সহ্য করানোর দায় আমার?–চেষ্টা করলে তোমার খুব ভালো লাগবে?

আমি বাইরের মানুষ সামনে বসে বলেই হয়তো রমণীর আরক্ত মুখ। মজুমদার মশাই জোরেই হেসে উঠলেন। মিলুর মুখের ওপর একটা বিরক্তিসূচক কটাক্ষ নিক্ষেপ করে সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে হিরু গুপ্ত দরজা টেনে করিডোরে চলে গেল।

স্টেশনে আসা এবং ট্রেনে ওঠার পর থেকে এইটুকু সময়ের মধ্যেই আমার ভিতরে ভিতরে একটা নিঃশব্দ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্ত্রটির সঙ্গে মজুমদার মশই স্টেশনেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে এই অবকাশটুকুর মধ্যে আমার কেবলই মনে হয়েছে, সেই সন্ধ্যায় পানাসক্ত হিরু গুপ্ত যে যন্ত্রণার কথা বলেছিল সেটা এই রমণীর কারণে। হিরু গুপ্ত সেটা আভাসেও আমার কাছে ব্যক্ত করেনি, শুধু সেই সন্ধ্যার কিছু কথা মনে পড়েছে। এই যোগাযোগে তার বিরক্তি, গাম্ভীর্য আর পরোক্ষ মনোযোগ এই রমণীর প্রতি যেন বিশেষভাবে নিবিষ্ট দেখেছি। ট্রেন আসতে ব্যস্তসমস্তভাবে হাত ধরে মিলুকে গাড়িতে তুলতে দেখেছি। অথচ এই ব্যস্ততার কোন হেতু নেই। ওদের পিছনে আমি। কুলির মাল তোলা হলে মজুমদার মশাই ধীরেসুস্থে আসবেন বোধ হয়। সরু করিডোর ধরেও রমণীটিকে পিছন থেকে প্রায় আগলে নিয়ে এসেছে হিরু গুপ্ত। চোখের ভ্রম কিনা জানি না, এমনও মনে হয়েছে–কনুইয়ের মৃদু ধাক্কায় রমণী তাকে একটু ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেছে আর তখন অস্ফুট স্বরে হিরু গুপ্ত গলা দিয়ে একটু ক্রুদ্ধ আওয়াজ বার করেছে। চলতি ট্রেনে জিনিসগুলো টুকটাক গুছিয়ে রাখার সময় ঝাঁকুনিতে রমণী দুই-একবার বেসামাল হয়েছিল, কিন্তু তাকে রক্ষা করার জন্য পিছনে হিরু গুপ্ত মজুত। সে তক্ষুণি তার দুই বাহুর ওপর দখল নিয়েছে। আর তারপর হিরু গুপ্তর বিরক্তিমাখা গম্ভীর চোখ কতবার যে ওই রমণীর মুখে এবং দেহে বিদ্ধ হতে দেখেছি ঠিক নেই। আমার ধারণা, পুরুষের এই চাউনি আমি চিনি। কিন্তু মজুমদার মশাই এ-সব সংশয়ের ধার-কাছ দিয়েও হাঁটেন মনে হয় না।

সিগারেট শেষ করে তেমনি অপ্রসন্ন মুখে তার জায়গায় এসে বসল। আপাতত তার জায়গা বলতে মিলুর পাশে। এদিকের বার্থে আমি আর মজুমদার মশাই। কথায় কথায় ছবির প্রসঙ্গ উঠল–অর্থাৎ যে ছবিতে

মজুমদার মশাই হাত দিয়েছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন হবে বলুন?

–আমি কি বলব!

–বাঃ আপনার গল্প, আপনি বলবেন না তো কে বলবে?

মহিলার দিকে ফিরে ঈষৎ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, বইটা আপনি পড়েছেন?

মৃদু হেসে মিলু সামান্য মাথা নাড়ল। মজুমদার মশাই বলে উঠলেন, বা রে, এই গল্প সিলেকশনের পিছনে আসল ব্যাপারটাই তো আপনি জানেন না দেখছি! বই পড়ে ও-ই তো প্রথমে আমার পিছনে লাগে–এবারে এই গল্পটা করো। আপনার বই তো আমি আজও পড়িনি মশাই, তিনবার করে ওর মুখে গল্প শুনেছি।

লেখক মাত্রেরই ভালো লাগার কথা! ভালো লাগল। মিলুরও হাসি-হাসি মুখ। চকিতে হিরু গুপ্তর দিকে তাকালাম। তার অসহিষ্ণু বিরস বদন। কারণ আমার কাছে গল্প সিলেকশনের যে ফিরিস্তি সে দিয়েছে তার সঙ্গে এটা মিলছে না। চোখাচোখি হতে মর্যাদা রক্ষার তাগিদে ঠোঁটের ফাঁকে হঠাৎ একটু হাসি ঝুলিয়ে উঠে একেবারে আমার কানের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল, ঠাকরোণকে দিয়ে কলকাঠিটি কে নেড়েছে দাদা সেটা জানলেও বলবে না। নিজের জায়গায় ফিরে গেল আবার। মিলুর চকিত চাউনি। মজুমদার মশাই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বললি শুনি?

হিরু গুপ্ত সাদাসাপটা জবাব দিল, বললাম, দাদা কার ক্রেডিট কাকে দিচ্ছে দেখুন! বউদির তোয়াজ করার সুযোগ পেলে তুমি ছাড়ো না!

মজুমদার মশাই সহাস্যে বললেন, তুই তো তোর বউদির কিছুই ভালো দেখিস না–এ গল্প কে আমার মাথায় ঢুকিয়েছে জেনেও লাগতে ছাড়বি না!

হিরু গুপ্তর হাসিটা তখনো ঠোঁটে ধরা আছে কিন্তু গলার স্বর একটু যেন অসহিষ্ণু।–তাহলে নাও গো, গল্পের ছবি কেমন হবে তুমিই লেখককে বলো।

নির্বাক মহিলার দুই চোখ অব্যাহতি চাইছে। হৃষ্টবদন মজুমদার মশাই বললেন, ও কি বলবে ছবি কেমন হবে না হবে! সে তো তোর ওপর নির্ভর করছে। আমার দিকে ফিরলেন–হিরু না থাকলে আমার ব্যবসা অচল আমিও অচল–সেটা জানে বলেই ওর এত দেমাক, বুঝলেন?

বার বার শাড়ির আঁচল টেনেটুনে বসাটা মহিলার একটা মিষ্টি অভ্যাস ভেবেছিলাম। এখন কেমন মনে হল, সেটা হিরু গুপ্তর ঘন-কটাক্ষ প্রতিহত করার দরুনও হতে পারে। মালিকের প্রশস্তি শুনে তার প্রসন্ন গম্ভীর তির্যক চাউনিটা রমণীর মুখের ওপর বিধে থাকল খানিক। আমার মনে হল, মিলু মজুমদারের ধড়ফড়ানি দেখলাম একটু।

হিরু গুপ্ত উঠে দাঁড়াল। মালিকের মন রক্ষার সুরে বলল, মুখ না চললে সত্যিই আর ভালো লাগছে না।

মজুমদার মশাই হাসলেন। ভাবখানা–আমি তো আগেই বলেছিলাম।

দুটো ছোট ডিশ আর একটা বড় ডিশে দুভাগ করে হিরু গুপ্ত শুকনো খাবার সাজালো। লোভনীয় সন্দেহ নেই। পেল্লাই সাইজের একটা করে চপ আর চিকেন কাটলেট, সঙ্গে মুখরোচক স্যালাড। ছোট ডিসের একটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, একটা মজুমদার মশাইয়ের দিকে। তারপর বড় থালার মত ডিশটা নিজেদের বেঞ্চের মাঝখানে রেখে রমণীর উদ্দেশে গম্ভীর রসিকতা করল, এসো–আমারটা নিয়ে টানাটানি কোরো না আবার!

সকলের চোখের ওপর বড় ডিশে দুজনের খাবারটা একসঙ্গে নেওয়া এমন কিছু দৃষ্টিকটু নয়, অথচ আমার ভালো লাগল না। ওদিকে রসিকতার জবাবে মিলু মজুমদার বলে ফেলল, আমি এখন খাবই না কিছু।

গলার স্বরটুকুও নিটোল মিষ্টি। কিন্তু এতেই হিরু গুপ্তের মেজাজ চড়ল, খাবে না মানে?

বিব্রত মুখে মিলু হাসতে চেষ্টা করল একটু।–খাব না মানে আবার কি—

–খাবে না তো আগে বললে না কেন?

তেমন মৃদু হাসি।–আগে তুমি জিজ্ঞাসা করেছ?

–আমাকে খাবার বার করতে দেখেও বললে না কেন?

–আচ্ছা আমারটা আমি রেখে আসছি।

–রেখে আসতে হবে না, তুমি খাবে কি খাবে না আমি জানতে চাই।

মিলু তার চোখে চোখ রেখেই আবার ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল– অর্থাৎ না। মজুমদার মশাই এতক্ষণ দেওর-ভাজের কথা-কাটাকাটি উপভোগ করছিলেন যেন। এবারে বললেন, আহা মিলু, ওকে রাগাচ্ছ কেন, যা হোক একটা তুলে নাও না!

বিরক্তি চাপতে চেষ্টা করে মিলু বলল, আমার এখন খাওয়ার ইচ্ছে নেই তবু জোর করছ কেন?

স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি হিরু গুপ্ত অপমান বোধ করছে। শেষবারের মতই জিজ্ঞাসা করল, তুমি খাবে না তাহলে?

তাকে জবাব দেবার বেলায় আবার হাসি-হাসি মুখ মিলুর। জবাব দিল না, মাথা নাড়ল– খাবে না।

সরোষে বড় ডিশটা নিজের দিকে টেনে নিল হিরু গুপ্ত। আমি ভাবলাম ওটা বুঝি এবার জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে! না, তার বদলে নিজে খাওয়া শুরু করল। ওর খাওয়ার এই একাগ্র ধরনটা আমি আগেও দেখেছি। আমাদের আগেই নিজের ভাগটা শেষ করল। পরে দ্বিতীয় ভাগটাও। আমি

আর মজুমদার মশাই হাসছি। অল্প। অল্প হাসছে মিলু। হাসি নেই শুধু হিরু গুপ্তের মুখে।

খাওয়া শেষ করে তিনটে ডিশই একসঙ্গে করে কোণের দিকে সরিয়ে রাখল। অ্যাটেনডিং কারে চাকর আছে, স্টেশনে গাড়ি থামলে সে এসে ওগুলো পরিষ্কার করে রেখে যাবে। আমরা আগেই জল খেয়ে নিয়েছিলাম। হিরু গুপ্ত ঢক ঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার করতে করতে দরজা খুলে করিডোরে চলে গেল। অর্থাৎ রাগ তার একটুও পড়েনি।

আমার দিকে ফিরে মজুমদার মশাই প্রসন্ন মন্তব্য করলেন, বেজায় চটেছে, ভয়ানক ভালবাসে তো–আর ও-ও ফাঁক পেলেই রাগাবে।

আড়চোখে রমণীর মুখখানা দেখে নিলাম। দুচোখ জানলা দিয়ে দূরের দিকে প্রসারিত।

সিগারেট একটু আধটু আমিও খাই। সেই অছিলায় বাইরে চলে এলাম। করিডোরে এসে দরজাটা আবার টেনে দিয়েছি।

বইরের দিকে চেয়ে হিরু গুপ্ত সিগারেট টানছে। আমার সিগারেট ধরাবার শব্দে একবার ফিরে তাকালো। গম্ভীর রাগ-রাগ মুখ।

বলে ফেললাম, আপনার হঠাৎ এত রাগের কি হল, ভদ্রমহিলার খিদে পায়নি তাই খেতে আপত্তি করেছেন।

ঠোঁটের সিগারেট হলদে দুই আঙুলের ফাঁকে উঠে এলো হিরু গুপ্তর। গোল দুটো চোখ আমার মুখের ওপর স্থির একটু। ক্রুদ্ধ চাপা স্বরে বলল, খিদের আসল চেহারাট আপনি জানেন? দেখেছেন কখনো?

মনে হল ইন্ধন যোগাতে পারলে হিরু গুপ্ত কিছু কথা বলতে পারে। কলকাতার। সেই হেঁটেলের পানভোজনের রাত থেকেই আমার মনে হয়েছে শোনানোর মত কিছু কথা হিরু গুপ্তর ঝুলিতে আছে। বোকা মুখ করে বললাম, সে আবার কি?

-আমি দেখেছি, বুঝলেন? তিন দিনে একদিন খাওয়া জোটে না, এই দুটো হাত ধরে বিবা মা আর মেয়ের সে কি আকৃতি–আমি গিয়ে না পড়লে খিদের জ্বালায়। ওই মেয়েকেই কটা হায়নার মুখে গিয়ে পড়তে হত খুব ভালো করে জানি–বুঝলেন?

সিগারেটে লম্বা অসহিষ্ণু দুটো টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে মন্তব্য করলে, আর এখন। তার এত অঢেল যে খিদে পায় না, যতসব ঢং–ওতে দাদা ভোলে, আমি ভুলি না!

একটু চেষ্টা করে মনে করতে হল।-হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

-সেদিন আপনার মেজাজ-পত্র ভালো ছিল না। খেতে খেতে কি একটা যন্ত্রণার। কথা বলহিলেন–আর বলছিলেন আপনার দাদার সেটা সব থেকে আনন্দের দিন আর সেই কারণেই ওটা আপনার সব থেকে খারাপ দিন।

গেল দুটো চোখ আমার মুখের উপর চক্কর খেল একপ্রস্থ। গাম্ভীর্য সত্ত্বেও অন্তরঙ্গ সুরেই বলল, আপনি খুব চতুর লোক, সেদিন বেমক্কা পেয়ে কথা বার করে নিয়েছেন।–সত্যি এক এক সময় এত যন্ত্রণা হয়!

বললাম, আত্মত্যাগের একটু-আধটু যন্ত্রণা আছেই।

শেষেরটুকু কানে গেলই না বোধ হয়, সাগ্রহে কাছে সরে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমার আত্মত্যাগের কথা ও আপনাকে বলেছিলাম নাকি?

-না, অনুমান করেছিলাম।

-কই করেছিলেন। বড় একটা নিশ্বাস ফেলে সিগারেটের খোঁজে পকেটে হাত ঢোকালে

যুর জায়গায় মোচড় পড়তে এরপর হিরু গুপ্ত যা জানালো তার সারমর্ম, বিধবা আর তার মেয়ে মিলুকে সে আগেই জানত। হুগলীর দিকে থাকত তারা। মেয়েটা দেখতে শুনতে ভালো আর খুব চালাক-চতুর। বরাবরই হিরু

গুপ্তর ভালো লাগত। নেক দিনের ছাড়াছাড়ির পর আবার যখন দেখা, ওই মা-মেয়ের অচল অবস্থা। তখন, ওয়া জোটে না, পরনের কাপড় জোটে না। সময়ে সে গিয়ে না পড়লে আর পাঁচজনে ছিঁড়ে খেত ওই মেয়েকে, ওদের ঘর আঁস্তাকুড় হয়ে উঠত। হিরু গুপ্ত মিলুকে ছবিতে নামাবে ঠিক করে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল। মিলু সানন্দে রাজী হয়েছিল কালে দিনে এই মেয়ে নামী নায়িকা হতে পারত। আর তারপর বিয়েটাও সে-ই করত। কিন্তু সব ভণ্ডুল করল দাদা অর্থাৎ মজুমদার মশাই। মিলুকে একটা ভালো জায়গায় রাখা হয়েছিল আর তার সবে তখন ট্রেনিং চলছিল। দরাজ হাতে দাদাই খরচ যোগাচ্ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তার এমন মনে ধরে গেল যে মেয়েটাকে আর ছবিতে নামতেই দিল না। বিয়ের প্রস্তাব করল। হিরু গুপ্ত কত বড় আঘাত পেল সে-ই জানে–দাদার জন্যেই সব, দাদার জন্যেই যা-কিছু। নিজে ওদের বিয়ে দিল। মিলু প্রথমে রাজী হয়নি, শেষে অনেক বোঝাতে তবে রাজী।…

এখন সেই মেয়েরই নাকি খিদে হয় না, সিগারেটের গন্ধ সহ্য হয় না!

দুজনেই চুপচাপ খানিক। চাপা আগ্রহে হঠাৎ হিরু গুপ্ত আবার বলল, কলকাতার। সেই হোটেলে আপনিও যেন কি বলেছিলেন–আমার যন্ত্রণার একটা ভাগ আর একজনও পাচ্ছে নাকি–সত্যি যন্ত্রণা পাচ্ছে? বলুন না?

মহিলার সপ্রতিভ মিষ্টি মুখখানা চোখে লেগে আছে। আজ আর হিরু ও গুর কথায় সায় দিতে পারা গেল না। বললাম, সেদিন কি বলেছিলাম মনে পড়ছে না–তবে সে রকম যন্ত্রণা কিছু পুষছেন বলেও তো মনে হয় না।

মিলু মজুমদার পরস্ত্রী হিরু গুপ্ত এই ভবিতব্যটা মেনে নিক এটুকু আমার কাম্য। তাই বলা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মুখ থমথমে আবার। সিগারেটে দুটো অসহিষ্ণু টান দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, আপনার মতে তাহলে উনি সুখের সাগরে ভাসছেন এখন, কেমন? কিন্তু ও নির্বোধ না হলে এতদিনে এও ওর বোঝা উচিত, সব সুখ আমি ঝাঁঝরা করে দিতে পারি–এই দুনিয়ায় দাদা আমাকেই সব থেকে বেশি বিশ্বাস করে, আমার ওপরই সব

www.bengaliebook.com

থেকে বেশি নির্ভর করে। ওকে ছাড়া দাদার চলতে পারে কিন্তু আমাকে ছাড়া চলে না সেটা ও জানে।

বিরক্তি গোপন করে জবাব দিলাম, ভালই যদি বাসেন তো এতবড় ক্ষতি আপনি করবেন কেন?

যন্ত্রণাপ্রসঙ্গে আমার সেই মন্তব্যের ফলেই মিলু মজুমদারের সঙ্গে তার পরের আচরণ আরো রুক্ষ হয়ে উঠল কিনা জানি না। কেবিনে ঢুকেও তার সঙ্গে আর কথাবার্তা কইতে দেখলাম না। তার রাগ মহিলা ঠিকই আঁচ করেছে মনে হল। তার তোয়াজের মুখ একটু। কিন্তু হিরু গুপ্ত নির্লিপ্ত, কঠিন।

ভোজের ব্যাপারে রসিক দেখলাম বটে আমার সহযাত্রী দুজন। চব্বিশ ঘণ্টার রাস্তার জন্য এত খাবারও কেউ আনে কল্পনা করা যায় না। বড় বড় অনেকগুলো ডিশে হিরু গুপ্তই একরাশ করে দুপুরের খাবার সাজালো। তারপর কতকগুলো ডিশ আমার আর তার দাদার দিকে ঠেলে দিল আর বাকি কটা নিজের দিকে টেনে নিল। মহিলা খাবে কি খাবে না তা নিয়ে যেন তার কোন মাথাব্যথা নেই।

মজুমদার মশাই ভাইয়ের রাগ দেখে মুখ টিপে হাসছেন। আমার চোখে চোখ। পড়তে মিলু বিড়ম্বনার ভাবটা কাটিয়ে সহজ হাসিমুখেই দেওরের দিকে তাকাল– আমাকে দিলে না?

মুখ ঈষৎ বিকৃত করে হিরু গুপ্ত তিক্ত প্রশ্ন ছুঁড়ল, আমার ছোঁয়া তোমার চলবে?

হাসি-হাসি মুখেই মিলু মাথা নাড়ল–অর্থাৎ চলবে।

এই তোষামোদেও হিরু গুপ্তর মেজাজ নরম হল না। সে নিবিষ্ট রুক্ষ মুখে। খাবার চালান করতে লাগল। হাসিমুখে মজুমদার মশাই চাপা গলায় আমাকে বললেন, বেজায় ক্ষেপেছে দেখছি আজ… আবার ভাব হতেও খুব বেশি সময় লাগবে না, আপনি খান!

তবু মহিলার দিকে চেয়ে বললাম, আমি দেব আপনাকে?

হিরু গুপ্তর ক্রুদ্ধ দুচোখ আমার মুখের ওপর চড়াও হল–আপনার দরদ দেখাতে হবে না, সকলেরই দুটো হাত আছে সেটা ও সকালেই বুঝিয়ে দিয়েছে।

কথা-কাটাকাটির ভয়েই যেন মিলু মজুমদার তাড়াতাড়ি উঠল। একটি মাত্র বড় ডিশ নিয়ে খাবার তুলে নিল। আমাদের তুলনায় অতি সামান্যই নিল বলতে হবে। এত সামান্য যে চোখে পড়ে। আমি বললাম, ও কি, নিজে নেবার ফলে যে কিছুই নিলেন না!

অল্প হেসে জবাব দিল, আমি এর বেশি পারি না।

খেতে খেতে হিরু গুপ্ত তপ্ত ব্যঙ্গ ছুঁড়ল, অঢেল থাকলে তখন বেশি পারা যায় না, না থাকলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খেতে পেলেও বেশি হয় না।

মিলু হাসছে বটে! কিন্তু হাসিটা কেমন নিষ্প্রভ মনে হল আমার। –হিরু গুপ্ত বলেছিল সমস্ত সুখ আঁঝরা করে দিতে পারে, সেটা সত্যি মহিলা জানে মনে হল। তোয়াজের অভিব্যক্তিটুকু হয়তো সেই কারণে।

বিকেলের ভারী জলযোগ-পর্বেও হিরু গুপ্তর মেজাজ একটুও নরম দেখলাম না। কি হল ভেবে না পেয়ে মিলও যেন বিস্মিত একটু। তবে রাতের আহার-পর্বের সময় হিরু গুপ্তর রুক্ষ মুখ কিছু ঠাণ্ডা মনে হল। তেরছা সুরে সে জিজ্ঞাসা করল, আমার পরিবেশন চলবে, না অশুদ্ধ হবে?

হাসিমুখেই মিলুকে তাড়াতাড়ি মাথা নাড়তে দেখলাম। অর্থাৎ চলবে। হিরু গুপ্তর মেজাজের পরিবর্তন অন্য কারণেও হতে পারে। সে খাবার সাজাবার তোড়জোড় করার সঙ্গে সঙ্গে মজুমদার মশাই আস্ত মদের বোতল বার করেছেন একটা। ঈষৎ সঙ্কুচিত চোখে মিলু আমার দিকে তাকিয়েছে। আমার সহজ হবার চেষ্টা–এ যেন অস্বাভাবিক কিছুই না।

আমার চলে না শুনে মজুমদার মশাই দুই-একটা হালকা রসিকতা করলেন। তার পর নিজের গেলাসে বেশ খানিকটা মদ ঢেলে নিলেন।

দ্বিতীয় গেলাসে ঢালার আগেই হিরু গুপ্ত বাধা দিল, আমি এখন না, শরীরটা ভালো লাগছে না।

-সে কি রে! ভালো লাগছে না বলেই তো এটা বার করলাম! সেই সকাল থেকে তোর যে রকম মেজাজ চলছে, খেলেই হালকা হয়ে যাবে, নে–

হিরু গুপ্ত বলল, তুমি খাও তো, আমার এখন ইচ্ছে করছে না, পরে দেখা যাবে। মজুমদার মশাই গোড়াতে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন বোধহয়, কিন্তু গেলাসের তরল পদার্থ প্রথম দফায় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হৃষ্টচিত্ত। আর বিপুল আহার সহযোগে আধখানা বোতল খালি হয়ে যাবার পর স্বতঃস্ফুর্ত আনন্দে দুলছেন তিনি, অর্থাৎ সোজা হয়ে বসতেও পারছেন না।

রাতেও মিলুর সেই পরিচ্ছন্ন স্বল্পাহার লক্ষ্য করলাম। ঠিক দেখছি কিনা জানি না, তার মুখে একটু শংকার ছায়া। আড়চোখে এক এক বার দেওরকে দেখে নিচ্ছে। হিরু গুপ্ত গভীর মনোযোগে খেয়ে চলেছে।

শরীরটা আসলে আমারই খুব খারাপ লাগছিল। মাথাটা সেই থেকে ধরে আছে, আর এখন বেজায় টন টন করছে। এই এক রোগ আমার। তখন কড়া ঘুমের বড়ি খেয়ে পড়ে থাকতে নয়, নইলে সমস্ত রাত ধরে যন্ত্রণা চলবে। সেই ট্যাবলেট সঙ্গেই থাকে। খাওয়া শেষ করে স্যুটকেস থেকে ট্যাবলেটের শিশিটা বার করতে দেখে মজুমদার মশাই টেনে টেনে জিজ্ঞেস করলেন, কি ওটা?

-ঘুমের ওষুধ, মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে সেই থেকে।

মজুমদার মশাই হেসে উঠলেন, বললেন, একেই বলে কপাল, যন্ত্রণার আর ঘুমের এমন মহৌষধ হাতের কাছে থাকতে আপনি ট্যাবলেট গিলছেন!

মিলুর খাওয়া আগেই হয়ে গেছল। এদেরও শেষ। ডিশ আর পাত্রগুলো সব একত্র করে হিরু গুপ্ত বাইরের করিডোরে রেখে এলো। নীচে খবরের কাগজ পাতা হয়েছিল, সেগুলো জড়ো করে জানালা দিয়ে ফেলে দিল।

www.bengaliebook.com

তারপর মুখ হাত ধুয়ে। মুহে সে বাইরে সিগারেট খেতে যাওয়ার উদ্যোগ করতে মজুমদার মশাই আবেদনের সুরে বললেন, আমার বিছানাটা আগে ঠিক করে দিয়ে যা–

অর্থাৎ তিনি আর বসতেও পারছেন না। কোনরকম উঠে ধপ করে মিলুর পাশে বসলেন। হিরু গুপ্ত তৎপর হাতে তার শয্যারচনা করে দিতে তিনি সেটি গ্রহণ করে বাঁচলেন যেন।

মিলুর শয্যাও একই সঙ্গে বিছানো হয়ে গেল। আমার কেমন মনে হল, ও যেন একটু বেশি চুপচাপ এখন। আমি ততক্ষণে আমার বার্থে উঠে গা এলিয়ে দিয়েছি। মি তার জানালার পাশে বসল। চড়া বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়ে হিরু গুপ্ত সবুজ আলোটা জ্বালতে মজুমদার মশাই বিড় বিড় করে উঠলেন, নিভিয়ে দে, নিভিয়ে দে–কি দরকার!

অতএব সেটাও নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে হিরু গুপ্ত বাইরে সিগারেট খেতে গেল। আর তার দুমিনিটের মধ্যে মজুমদার মশায়ের পরিতৃপ্ত নাসিকা-গর্জন শোনা যেতে লাগল।

আমি হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করছি কেন একটু, জানি না। মিনিট পনেরো বাদে হিরু ও নিঃশব্দে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল টের পেলাম। ঘুমে তখন দুচোখ বুজে আসছে আমার। ভিতর থেকে দরজা লক করে ঘুরে দাঁড়াল। অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল একটু। জানলা খোলা থাকায় নীচের দিকটা সামান্য আবছা দেখা যাচ্ছে। ওপরটা একেবারে অন্ধকার।

হিরু গুপ্ত পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে মিলুর বেঞ্চির অন্য ধার ঘেঁষে বসল। এক্ষণি আপার বার্থে উঠে শোবার ইচ্ছে নেই বোধহয়। মজুমদার মশাইয়ের নাকের গর্জন বেড়েছে। মিলু জানলার দিকে মুখ করে বসে আছে।

ঘুমে চোখ তাকাতে পারছি না, কিন্তু ভিতরের অস্বস্তি বাড়ছেই। মিলুর মুখে শঙ্কার ছায়া দেখেছিলাম কেন–হিরু গুপ্ত মদ খাচ্ছে না বলে?

অস্বস্তি নিয়েই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলাম হয়তো। কতক্ষণ কেটেছে জানি না। চোখ টান করে দেখি মিলু তেমনি জানলার কাছে বসে আছে, আর হিরু গুপ্ত ওখানে বসেই সিগারেট টানছে—সস্তা কড়া সিগারেটের উগ্র গন্ধ নাকে আসছে।

হঠাৎ রাগই হচ্ছে আমার। কিন্তু বেশিক্ষণ চোখ তাকিয়ে থাকা গেল না। এবারে ঘুমিয়েই পড়লাম।

কিন্তু ভিতরের অস্বস্তিটাই আবার আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে কিনা জানি না। যে দৃশ্য দেখলাম, ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। মিলু জানলার কাছ থেকে সরে এসেছে। আর হিরু গুপ্ত খানিকটা ওধারে সরেছে। দুজনের মাঝে বড়জোড় হাত খানেক ফারাক। সেটুকুও কমিয়ে আনার জন্য হিরু গুপ্ত মিলুর একখানা বাহু ধরে টানাটানি করছে, আর মিলু একবার তার হাত ঠেলে সরাচ্ছে আর দুহাতে এক-একবার ধাক্কা দিয়ে। তাকে বেঞ্চির ওধারে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। ফলে হিরু গুপ্তর। উপদ্রবের চেষ্টাটা এক-একবার আরো অশালীন হয়ে উঠছে।

দুজনের কারো মুখে ফিস ফিস শব্দটিও নেই। শুধু মজুমদার মশাইয়ের নাকের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

মাথায় রক্ত উঠছে আমার। চিৎকার করে ধমকে উঠতে ইচ্ছে করছিল। এদের এই নিঃশব্দ লীলা কতদূর গড়াবে আরো?

গাড়ির গতি হঠাৎ শ্লথ হয়ে আসতে নীচের ওই দুজন সচেতন একটু। হয়তো স্টেশন আসছে। গতি কমছেই। শেষে বিচ্ছিরি রকমের একটা ঘটাং-ঘটাং শব্দ করে গাড়িটা থেমেই গেল। সেই শব্দে যেন ঘুম ভাঙল আমার। গলা-খাঁকারি দিয়ে আড়মোড়া ভাঙলাম। তারপর উঠে বসলাম।

হিরু গুপ্ত ততক্ষণে বেঞ্চির এধারে সরে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, স্টেশন নাকি?

—না, এমনি থেমেছে।

–আপনি শোননি এখনো? কটা বাজল?

অন্ধকারেই ঘড়ি দেখে জবাব দিল, একটা। আমার অত চট করে ঘুম আসে না। একটু বাদেই গাড়ি চলতে শুরু করল আবার। আর আমিই বা শুয়ে না পড়ে কি করব! বেশ খানিকক্ষণ জেগেই ছিলাম, ওরা তফাতেই বসে আছে। শেষে ঘুমের জ্বালায় অস্থির হয়ে ওদের দুজনকেই মনে মনে জাহান্নমে পাঠিয়ে ও-পাশ ফিরলাম।

আবার যখন ঘুম ভাঙল, সকাল।

হিরু গুপ্ত আপার বার্থে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। নীচে মজুমদার মশাইয়ের ঘুম ভাঙেনি তখনো। মিলু জানলার পাশে বসে আছে। একটু আগে মুখে-চোখে জল দিয়ে এসেছে। বোধহয়। ভেজা-ভেজা মুখখানা মিষ্টি। কিন্তু আমার কুৎসিত লাগছে। রাতের লীলা কোন পর্যন্ত গড়িয়েছে আমি জানি না।

আটটায় পৌঁছবার কথা। সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ সকলে উঠে পড়েছে।

মনে হল মিলু আর হিরু গুপ্ত এক-একবার আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি ওদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছি না বলেই হয়তো।

গাড়িটা একটা গণ্ডগ্রামের মত জায়গায় থেমে আছে কেন বুঝছি না। ধারে-কাছে লোকালয় নেই। দুদিকে খাঁ-খাঁ মাঠে আধা-শুকনো একটা বিল–দূরে জঙ্গলের রেখা।

খানিক বাদে কনডাক্টর-গার্ডের মুখে শুনলাম, সামনে কি গণ্ডগোল হয়েছে তাই গাড়ি লেট। পরের বড় স্টেশন ফয়েজাবাদ, কিন্তু সেও সাতাশ মাইল দূরে এখান থেকে। ওখানে পৌঁছাবার আগে চা বা কোনরকম খাবার মেলার আশা নেই।

মজুমদার মশাই আর হিরু গুপ্তর মুখ দেখার মত। সকালে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ এ যেন এক বজ্রাঘাত। বেলা দশটা না বাজতে অন্য কেবিনের যাত্রীদেরও ছটফটানি দেখা গেল। গাড়ির বহু যাত্রী নীচের প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেলা দেড়টা নাগাদ হিরু গুপ্ত খবর নিয়ে এলো ফয়েজাবাদের আগে কোথায় এঞ্জিন উল্টে আছে। লাইনও গেছে। আমাদের গাড়ির এঞ্জিন সাহাযার্থে সেখানে চলে গেছে। অতএব এ গাড়ি কখন নড়বে তার কিছুই ঠিক নেই।

শুনে মজুমদার মশাই হাল ছেড়ে শুয়েই পড়লেন। এদের দুজনকে দেখে মনে হল বেলা দেড়টার মধ্যেই যেন দেড় দিন ধরে উপোসী!

ক্লান্তিকর ভাবে ঘড়ির কাটা বিকেল সাড়ে চারটের কাছাকাছি পৌঁছল। এক গাড়ি লোকের একটা ক্ষুধার অসহিষ্ণ চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গাড়ির পাঁচ ভাগের চার ভাগ লোক তখন নীচে। শুনলাম অনেকে খাওয়ার সন্ধানে চার মাইল দূরের গাঁয়ের দিকে চলে গেছে। যারা জানে এ এলাকা তারা বলছে, ওই গণ্ডগ্রামে চিড়ে-মুড়ি জুটবে কিনা সন্দেহ! অদূরের প্রায়-শুকনো বিলে কয়েকজন গাঁয়ের লোক ছিপ ফেলে মাছ। ধরছে। সেখানেও ভিড় করে ট্রেনের যাত্রী দাঁড়িয়ে গেছে। দুই-একটা পাঁকাল মাছ। উঠতে দেখলে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠছে আর চোখ দিয়ে গিলছে।

বেলা বাড়ছে। সূর্যের তেজ কমছে। যাত্রীদের ফার্স্ট সেকেণ্ড থার্ড ক্লাসের বিভেদ ঘুচে গেছে। তাদের মিলিত জটলায় শুধু ক্ষুধার চিত্রটাই উদগ্র হয়ে উঠছে। মজুমদার মশাই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছেন। আমার মনে হল খিদের জ্বালায় ধুকছেন তিনি। ধুকছে হিরু গুপ্তও। কিন্তু তার ক্ষিপ্ত অসহিষ্ণু আচরণ। একবার নেমে যাচ্ছে, খানিক বাদে উঠে আসছে, আবার নামছে। আর কার উদ্দেশে অনবরত গালি-গালাজ ছুঁড়ছে। সে-ই জানে। মিলু জানলার ধারে বসে আছে সেই থেকে। তারও মুখখানা শুকনো। তবু গতরাতের কথা ভুলতে পারি না, ভিতরটা তার ওপরে বিতৃষ্ণ হয়েই আছে।

সূর্য পাটে নামল। দিনের আলোও দ্রুত কমে আসতে লাগল। একটু বাদেই ওই খোলা আকাশের নীচের অন্ধকারে আমরা ডুবে যাব। প্রায় ছটা, এখন বিকেল। ক্ষুধার অসহিষ্ণু চিত্র জমজমাট। শোনা গেল বেশি রাতের আগে এখান থেকে গাড়ি নড়ার আশা নেই।

-রাম নাম স্যত হ্যায়! রাম নাম স্যত হ্যায়!

আমরা সচকিত হয়ে সামনের দিকে তাকালাম। এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে চাদরে ঢাকা শব নিয়ে আসছে মাত্র চারজন গ্রামের লোক। মজুমদার মশাই চমকে উঠে বসেছেন। আমরা ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখছি। নীচের বহু যাত্রীরও দৃষ্টি ওই শবের দিকে। লোকালয় ছাড়িয়ে এই নির্জন প্রান্তরে কোথায় শ্মশান ধারণা নেই। লোকগুলো শব নিয়ে ট্রেনটার একেবারে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে দেখলাম।

একটু বাদেই নীচের যাত্রীদের কারো কারো মধ্যে একটু যেন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। দ্রুত পায়ে তারা ট্রেনটার পিছন দিকে চলেছে। পরক্ষণে হতচকিত আমরা। হিরু গুপ্ত বাইরে ছিল, ছুটে এসে কেবিনে ঢুকল, তার পরেই ঝোলানো জামার পকেট থেকে মানিব্যাগটা তুলে নিয়ে সা করে ছুটে বেরিয়ে গেল। কি ব্যাপার আমরা ভেবে পেলাম না। ঝুঁকে দেখলাম দ্রুতপায়ে আরো অনেকে যেন ট্রেনটার পিছনের দিকে চলেছে। কিন্তু তখন অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, কিছুই ঠাওর হল না।

প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে মস্ত একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে ঘর্মাক্ত হিরু গুপ্ত কেবিনে ঢুকল। মুখে দিগ্বিজয়ের হাসি।

আমাকে বলল, কেবিনের দরজাটা বন্ধ করুন শিগগীর!

করলাম।

মস্ত শালপাতার ঠোঙায় খাদ্যসামগ্রী দেখে আমরা বিস্মিত এবং পুলকিত। ওতে আছে অনেকগুলো বড় বড় আলু-সেদ্ধ, তার ওপরে একগাদা কাবলিছোলাসেদ্ধ আর শশা, এবং তার ওপর একরাশ ফুচকা। অন্য ছোট ঠোঙায় নুন, লঙ্কাগুঁড়ো আর পেঁয়াজ।

মজুমদার মশাই উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন।–এত কোত্থেকে পেলি?

হিরু গুপ্ত হাসিমুখে যে সমাচার শোনাল, আমরা হতভম্ব। গাঁয়ের ওই চারটে লোক লুঠপাটের ভয়ে এই খাবারগুলো দিয়েই একটা শব সাজিয়ে নিয়ে

এসেছিল। এ-রকম ওরা নাকি আগেও করেছে। ভিড়ের মধ্যে মাল আনলেই লুঠ হয়ে যায়। ট্রেনের শেষ মাথায় বেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে শবের ঢাকা খুলে বিক্রি শুরু করেছে। বরাতজোরে হিরু গুপ্ত ওদিকেই ছিল তখন। একটু দেরি হলেই কিছুই আর জুটত না। ব্যাটারা এরই দাম নিয়েছে নটাকা।

সোল্লাসে চারটে ডিশে ওই আলু-সেদ্ধ কাবলিছোলা শশা আর ফুচকা সাজাল হিরু গুপ্ত। এখনো দেখলাম মিলু তার ডিশে বেশি দিতে দিল না।

এই খিদের মুখে এই খাদ্যও অমৃত মনে হতে লাগল আমাদের। খুশি মেজাজে গোগ্রাসে গিলছে হিরু গুপ্ত আর মজুমদার মশাই। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, মিলু তার ডিশ সরিয়ে রেখেছে, খাচ্ছে না।

লক্ষ্য মজুমদার মশাইও করলেন–কি হল, খাচ্ছ না যে?

মিলু মৃদু জবাব দিল, সন্ধ্যাটা পার হোক, তোমরা খাও।

এই মেয়েলিপনা দেখে ওরা বিরক্ত। হিরু গুপ্ত শাসালো, দেরি করলে আমিই মেরে দেব কিন্তু, এখন বেজায় খিদে!

মিলু হেসেই জবাব দিল, নাও না–দেব?

–থাক, অত আত্মত্যাগে কাজ নেই।

আমাদের আহার সমাধা হল। মজুমদার মশাই আর হিরু গুপ্ত ঢকঢক করে জল খেয়ে পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। এখন একটু জোর পাওয়ার ফলে হিরু গুপ্তর সঙ্গে এবারে মজুমদার মশাইও কেবিনের বাইরে গেলেন।

আমি মজুমদার মশাইয়ের সচিত্র ফিল্ম ম্যাগাজিনটা ওল্টাতে লাগলাম।

একটু বাদেই মিলু মজুমদারকে একটু যেন সচকিত দেখলাম। মুখ না তুলেও মনে হল বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছে। কিছু বলবে কিনা ভেবে

www.bengaliebook.com

পেলাম না। কৃত্রিম মনোযোগে চোখ দুটো জার্নালের দিকে আটকে রেখেছি।

নিঃশব্দে একবার উঠে কেবিনের দরজা দিয়ে দুদিকের করিডোর দেখে নিল মিলু। তারপর আবার এসে বসল। আমার পড়ার মনোযোগ লক্ষ্য করল। তারপর নিজের খাবারের ডিশটা আঁচলের আড়ালে নিয়ে তেমনি নিঃশব্দে কেবিন ছেড়ে বেরুল।

জার্নাল ফেলে আমি কেবিনের দরজার সামনে দাঁড়ালাম।

দেখলাম ডিশ হাতে মিলু দ্রুত ডানদিকের খোলা দরজার সামনে গেল। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছি। মিনিট দুই-তিনের মধ্যেই নীচের দুতিনটে অল্পবয়সী গ্রাম্য ছেলে এসে দাঁড়াতে ওদের ডেকে ডিশের সব খাবার ঢেলে দিয়েই মিলু তাড়াতাড়ি ফিরতে গেল।

-আমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

চকিতে বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে আমার পাশ ঘেঁষে দত্তপায়ে কেবিনে ঢুকে গেল সে। আমিও এলাম।

অপ্রতিভ মুখখানা আবার লালছে দেখাচ্ছে একটু।

জিজ্ঞাসা করলাম, খাবার সব এভাবে দিয়ে দিলেন যে?

বিব্রত সুরে জবাব দিল, রাম নাম করে যেভাবে শব সাজিয়ে ওগুলো নিয়ে এসেছে… মনে হচ্ছিল ওতে শবের ছোঁয়া লেগে গেছে… ইয়ে আমার বড় খারাপ অভ্যেস–তারপরেই অনুনয়ের সুরে বলল, ওই শয়তানটাকে আপনি যেন কিছু বলবেন না, আমাকে তাহলে খেয়ে ফেলবে

শয়তান অর্থাৎ হিরু গুপ্ত। চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে আছি। সংযমের এক অনির্বচনীয় কমনীয় মূর্তি দেখছি যেন। গতরাতের বিতৃষ্ণ অনুভূতিটা দ্রুত নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মাথা নাড়লাম– বলব না। নিঃসংশয়ে অনুভব করছি, এই মেয়েকে শুচিতার গণ্ডি থেকে বার করবে এমন সাধ্য হিরু গুপ্তর নেই।

ফেরারী অতীত

তখনো ভালো করে ফর্সা হয়নি, বিশ হাত দূরে চোখ চলে না। কামরার মধ্যে বেশ একটা গুঞ্জন উঠতে রামকৃষ্ণবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। সামনে পাশে পিছনে ফটাফট জানলা খোলার শব্দ।

পামবান ব্রিজ আসছে। গাড়ির গতি কমেছে। ওই ব্রিজ পার হলে খানিকক্ষণের মধ্যে রামেশ্বরম–সাদা বাংলায় রামেশ্বর। যাত্রীদের এই ব্রিজ সম্পর্কে একটু বাড়তি আগ্রহের কারণ আছে। এই সেতু পেরুলে মহামোক্ষ ক্ষেত্র। সেতুর এধারে বন্ধন ওধারে মুক্তি। ওই সেতু উত্তরণের আগে পার্থিব জগতের যা-কিছু সব ওধারেই ফেলে এসো।

কজন সত্যিই তাই আসে রামকৃষ্ণবাবু জানেন না। তবু নির্লিপ্ত মুখে তিনিও সামনের জানলাটা খুললেন। ট্রেন ব্রিজে উঠলেই অন্যরকম শব্দ। এদিকের সবই ছোট লাইনের ছোট ট্রেন। তা সত্ত্বেও ব্রিজে ওঠার আগে থেকেই গাড়িটার শম্বুকগতি একেবারে। এটা কোনো নিরাপত্তার কারণে কি যাত্রীদের সুবিধার্থে রামকৃষ্ণবাবু জানেন না।

আবছা অন্ধকার ভেদ করা একটা একাগ্রতা নিয়ে দেখতে লাগলেন তিনিও। শতসহস্র সেতুর মতোই একটা। তবে নীচে নদীর বদলে সমুদ্র– সমুদ্রের ফালিও বলা যেতে পারে। সেতুটা বিশাল বটে, অনেকক্ষণ লাগল পার হতে। কামরার মধ্যে মেয়ে পুরুষদের সমুদ্রে পয়সা ফেলার হিড়িক পড়ে আছে। লোভ কাম মোহ মাৎসর্যের প্রতীক দুনিয়া তিননয়া পাঁচনয়া দশনয়া সিকি আধুলি বিসর্জন দিয়ে মুক্ত মন নিয়ে মহাধামে পদার্পণের প্রেরণা কিনা এটা রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী জানেন না। একটি মহিলার তার দেড় বছরের শিশুকে দিয়েও সমুদ্রে পয়সা ফেলার উদ্দীপনা লক্ষ্য করে নিজের মনেই হেসেছেন।

www.bengaliebook.com

রামেশ্বরে গাড়ি থামল যখন, চারদিক বেশ পরিষ্কার। যাত্রীদের নামার তাড়ায় ব্যাঘাত না ঘটিয়ে রামকৃষ্ণবাবু অপেক্ষা করলেন খানিক। তাঁর কোন তাড়া নেই। তিনি তীর্থ করতে আসেননি। কোনো মানত নিয়েও আসেননি। এখানে এক দিন থাকবেন। কি তিন দিন নিজেও জানেন না। ভালো লাগলে দুতিন দিন কাটাবেন, না লাগলে আবার বেরিয়ে পড়বেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালই লাগছে তাঁর। জীবনের এই প্রৌঢ় প্রহরে থার্ড ক্লাস কামরার সর্বসাধারণের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পেরে বেশ একটা বৈচিত্র্যের স্বাদ উপভোগ করছেন। এদের কেউ তাকে চেনে না, কেউ জানে না, কেউ ঈর্ষা করে না, কেউ তোষামোদ করতেও আসে না। নামের মোহ, নামের। যশখ্যাতি, প্রতিপত্তির শেকল থেকে একটা মুক্তির স্বাদ যে এভাবে অনুভব করা যায়। –রামকৃষ্ণবাবু দীর্ঘদিনের আরাম-ঘরে বন্দী থেকে সেটা যেন ভুলতেই বসেছিলেন। …বাড়ির গাড়িতে মেয়ে আর ছোট ছেলে সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে এসে মাদ্রাজ মেলের ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ কামরায় তুলে দিয়ে গেছল। বড় আর সেজ ছেলে খুঁতখুঁত করছিল।–এয়ার কনডিশনে গেলেই ভালো হত। তিন বউমা রেশারেশি করে যাত্রার সুব্যবস্থায় উঠে-পড়ে লেগেছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণবাবু শেষ পর্যন্ত একটা হোলড অল আর ছোট সুটকেস ভিন্ন আর কিছুই নিতে রাজি হলেন না দেখে তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছে। শ্বশুরের একটু বিবাগী মনোভাব লক্ষ্য করে ভিতরে ভিতরে যেন উতলা হয়েছে তারা। ফার্স্ট ক্লাস থেকে বেরিয়ে থার্ড ক্লাস কামরায় এ-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি, জানলে তাদের চোখগুলো কপালে উঠত। মেয়ে বার-বার করে বলে দিয়েছে, দুদিন পরে পরে একখানা করে চিঠি দেবে বাবা, নইলে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় থাকব। বড় বউমা বলেছিল, ঠিকঠিক খবর না পেলে কিন্তু আপনার ছেলে কাজকর্ম ফেলে মাদ্রাজ ছুটবে। তখন অন্য বউমাদের দিকে চেয়ে রামকৃষ্ণবাবুর মনে হয়েছে- এ-রকম কথা ওদেরও বলার ইচ্ছে ছিল।

..মাদ্রাজে পৌঁছে তিনি টেলিগ্রামে পৌঁছানো-সংবাদ এবং কুশল সংবাদ দিয়েছেন। তারপর সাতদিনের মধ্যে অনির্দিষ্ট পর্যটনে বেরিয়ে পড়ার আগে তাদের চিঠি লিখে জানিয়েছেন, এত ভালো আছি যে এক জায়গায়

www.bengaliebook.com

আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না। বেরিয়ে পড়ছি, কখন কোথায় থাকব এরপর ঠিক নেই, নিয়মিত চিঠিপত্র না পেলে একটুও চিন্তা কোরো না।

...দেখলে কেউ বলবে না রামকৃষ্ণবাবুর বয়েস এখন সাতান্ন। শরীর শক্ত মজবুত এখনো। চুলের তলায় তলায় কিছুটা পাক ধরেছে, একটা দাঁত নড়েনি বা পড়েনি। এখন তার পোশাক ঢোলা পাজামা আর ঢোলা রঙিন পাঞ্জাবি। এই পোশাকে বয়েস আরো কম দেখায়। এভাবে বেরিয়ে পড়ার পর রামকৃষ্ণবাবু যেন একটা ভারী মহার্ঘ্য জিনিস ফিরে পেয়েছেন। সেটা তাঁর যৌবন আর যৌবনস্মৃতি। শক্তসমর্থ লোকের মতোই ঘোরাফেরা করছেন–কারো মুখাপেক্ষী নন, সম্পূর্ণ নিজের ওপর নির্ভরশীল। ...দীর্ঘদিন ধরে এই আত্মপ্রত্যয়টুকুই তিনি খুইয়ে চলেছিলেন। ছেলেমেয়ে বউমা নাতি নাতনী পরিবৃত হয়ে তিনি যেন অকালে বুড়িয়ে যাচ্ছিলেন। বেশ একটা খোশমেজাজের জরা নেমে আসছিল তার ভিতরে বাইরে।

..প্রত্যয়ের এই নতুন স্বাদে ভরপুর হয়ে স্ত্রীর কথাও চিন্তা করেছেন বইকি। আজ পাশে সে শুধু সে থাকলে বেশ হত। স্ত্রীর বেড়াবার ঝোঁকও ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণবাবু তখন সাফল্যের ভরা জোয়ারে ভাসছেন, এই জোয়ার থেকে কেউ তটে এসে বিরাম চায় না।

গাড়ি ফাঁকা। যাত্রীরা সব নেমে গেছে।

রামকৃষ্ণবাবু উঠলেন। কুলীর মাথায় হোলড়-অল আর ছোট সুটকেস তুলে দিয়ে প্রথমে রেলওয়ের রিটায়ারিং রুমের সন্ধানে এলেন।

সিঙ্গল রুম ভাড়া হয়ে গেছে, ডাবল রুমের ভাড়া বেশি–সেটা খালি আছে। রামকৃষ্ণবাবু সেটা বুক করে মালপত্র রেখে নিশ্চিন্ত।

রামেশ্বরে এসে সমুদ্রস্নান না করলে আসাটাই অসমাপ্ত। পুণ্যের লোভ না থাকলেও সমুদ্রস্নানের ইচ্ছে আছে রামকৃষ্ণবাবুর। মুখ-হাত ধোওয়া চা-খাওয়া ইত্যাদির পর গামছা আর নতুন একপ্রস্থ পাজামা পাঞ্জাবি কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এলেন। রামেশ্বরের মন্দির এবং স্নানের জায়গা কাছাকাছি। স্নান সেরে মন্দিরে পূজো দেওয়ার বিধি।

টমটমে করে স্নানের বাঁধানো চাতালের সামনে নামলেন। স্টেশন থেকে তিন। কোয়ার্টার মাইল পথ হবে–রোদ চড়া তখন।

এ-সময় সমস্ত মানুষেরই গন্তব্যস্থান ওই একটি। টমটম থেকে নামতেই দুজন পাণ্ডার চেলা দুদিক থেকে এগিয়ে এলো। এদিকের পাণ্ডার সঙ্গে তাদের তফাৎ হল তারা বিনীত বেশ। রামকৃষ্ণবাবু মাথা নাড়লেন, পাণ্ডার দরকার নেই। একটু চেষ্টা করে একজন সরে গেল, আর একজন ছোকরা কিন্তু লেগেই থাকল। সে আবার জামা জুতো রাখার ভার নেবে, পূজোর সব ব্যবস্থা এবং দর্শনাদি করিয়ে দেবে, এমন কি আজকের বিশেষ পূণ্যদিনে ওই যে মাতাজী এসেছেন রামঝরক্কা থেকে, তারও দর্শনলাভের এবং আশীর্বাদলাভের ব্যবস্থা করে দেবে।

সমুদ্রের ডানদিক ঘেঁষা উঁচু বিশাল বাঁধানো চাতালের একদিকে হাততুলে দেখালো সে। সেখানে দস্তুরমতো মেয়ে-পুরুষের ভিড়। অর্থাৎ মাতাজীর দর্শন এবং আশীর্বাদ। লাভ করছে তারা।

রামকৃষ্ণবাবু মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ কিছুরই দরকার নেই। কিন্তু লোকটা নাছোড়। সবিনয়ে বলতে লাগল, দেবস্থানম-এ এসেও ছেলেমেয়ের কল্যাণের জন্য পূজো দেবে না এ কেমন কথা বাবুজী– ভগবানের কাছে ডালি দাও, ছেলেপুলের ভালো হবে।

এইবার রামকৃষ্ণবাবু থমকালেন। ছেলেমেয়ের কল্যাণ তিনি চান, মঙ্গল চান। পূজো দিলে কতটুকু কল্যাণ বা মঙ্গল হবে জানেন না, কিন্তু না দিলে ক্ষতি হবে কিনা কে জানে। আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাননি, কোথায় কি আছে, কোন জায়গার কি স্থানমাহাত্ম কে জানে?...কাতারে কাতারে লোক সমুদ্রে স্নান করছে, সকলেই তারপর পূজো দেবে। কিছুই যখন জানেন না কি হয়, আত্মাভিমান নিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকার দরকার কি? তাছাড়া এখানে কে চিনছে, কে জানছে তাঁকে? পরে ছেলেমেয়েদেরও জানার দরকার নেই...এই আত্মপ্রসাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার দরকার কি?

www.bengaliebook.com

চেলার হাতে জামাকাপড় জিম্মা করে কোমরে গামছা জড়িয়ে তিনি সমুদ্রে নামলেন। তার আগে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলেন, পাণ্ডার চেলা তরতর করে ওই বাঁধানো উঁচু চাতালে উঠে গেল। মন্ত্র-মোক্ষদাতারা সব ওখানেই বসে।

অনেকক্ষণ ধরে চান সেরে উঠে এলেন। নুন-জলে গা চটচট করছে। ঘরে ফিরে আবার একদফা চান করতে হবে। কিন্তু খুব তাজা লাগছে এখন, আর বয়েসটা যেন আরো কম ঠেকছে নিজেরই।

ডালি হাতে পাণ্ডা চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে। ভিজে জামাকাপড় বদলানোর নামে সে ঘনঘন মাথা নাড়লে। সিক্তবস্ত্রে পূজো দেওয়ার বিধি। বলল, চাতালের ওই পুরোহিতের কাছে মন্ত্রপাঠ শেষ করে মন্দিরে যেতে হবে। তারপর দ্বাদশ কুণ্ডর মিঠে জলে স্নান করে দর্শন ও পূজো শেষ করতে হবে।

মিঠে জলের স্নান ছাড়াও নিজের সহিষ্ণুতা যাচাইয়ের ইচ্ছেও হল। নেমে গেছেন। যখন রামকৃষ্ণবাবু–সব ঠিক আছে।

এগারোটি টাকা আগে গুনে দিয়ে পুরোহিতের সামনে আসনে বসলেন। পুরোহিত জিজ্ঞাসা করলেন, কার কল্যাণে পূজো?

একটু ভেবে রামকৃষ্ণবাবু তিন ছেলে আর মেয়ের নাম করলেন। মনে মনে তাদের সুমতি প্রার্থনা করলেন। পুরোহিতের সঙ্গে মন্ত্র আওড়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যেই বিমনা হয়ে পড়লেন। ছেলেদের, মেয়ের, বউমাদের একে একে সকলের মুখগুলো চোখে ভাসল রামকৃষ্ণবাবুর–আর কিছু না চেয়ে শুধু সুমতি চাইলেন কেন?

না, বাইরের আচরণে কোনদিন কারো ওপর বিরূপ হননি রামকৃষ্ণবাবু। কিন্তু চাপা খেদ বা ক্ষোভ একটু ছিল বইকি। নিজের স্ত্রীর মেজাজপত্র খুব ভালো ছিল না। হয়তো একটু অল্পেতেই রেগে যেতেন। কিন্তু রামকৃষ্ণবাবু ঠিকই অনুভব করতেন ছেলেরা বা বউমারা তাদের মা বা শাশুড়ীর ওপর তুষ্ট ছিল না খুব। ওদের আচরণে আঘাত পেয়ে স্ত্রীকে অনেক সময় স্তব্ধ

দেখেছেন। ছেলেদের অথবা ছেলের বউদের কিছু বলতেন না, স্ত্রীকেই বোঝাতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু মনের ব্যথা মনেই চাপা থাকত।

শাশুড়ীর পরে কর্তৃত্বের হাত-বদল হয়েছে। ছেলেরা চোখ রাখে তার ওপর, বউমারা যথাসাধ্য সেবা-যত্ন করে, মেয়ে একদিন অন্তর একদিন এসে বাপের খবর নেয়। তবু সে-সবের কোনো তাপ যেন বুকের তলায় স্পর্শ করে না। উল্টে টুকরো টুকরো এক-একটা ব্যাপার মনে পড়লে হাসি পায়। কিন্তু সে-হাসি খুব সুখের নয়। ... বাড়িটা তিন ছেলের নামে লেখাপড়া করে দেবার পর মেয়ে-জামাইয়ের মুখ শুকনো-শুকনো মনে হয়েছে। বাড়িটার দাম ধরে তার তিন ভাগের এক ভাগ নগদ টাকা মেয়ে-জামাইয়ের নামে চালান করার সময় আবার ছেলেদের বা বউমাদের মুখে তেমন উৎসাহ চোখে পড়েনি।

..গল্প উপন্যাস মিলে কম করে দেড়শ বই আছে রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর; এই সাতান্ন বছর বয়সেও সম্পাদক আর প্রকাশকদের তাগিদের জ্বালায় অস্থির হতে হয়। সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকরা এখনো বাড়িতে হানা দেয়। তার লেখা বহু উপন্যাস গল্প এযাবত ছবি হয়ে গেছে–আরো অনেক হতে পারে। এ ছাড়াও ওই দেড়শ গল্প-উপন্যাসের বইগুলো বেশির ভাগই সচল এখনো। মাস গেলে মোটা রয়েলটি আসে। এই সব বই কিভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে ছেলেদের আর মেয়ের মনে সেজন্যে একটু প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ আছে মনে হয়। ছেলেরা একবার হালকা কথাবার্তার ফাঁকে এই প্রসঙ্গ উত্থাপনও করেছিল।

হঠাৎ সচকিত রামকৃষ্ণবাবু, পুরোহিতের মন্ত্র পড়ানো কখন শেষ হয়েছে কে জানে–বাবুকে ভাব-তন্ময় মনে করে পুরোহিত আর তার চেলা নির্বাক।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। চাতাল অনেকটা ফাঁকা এখন। কোণের দিকের মাতাজীর সামনে মাত্র পাঁচ-সাতটি মেয়ে পুরুষ দাঁড়িয়ে এখন। বাতাসে তার লালপাড় শাড়ির আঁচল উড়ছে। একটু উঁকি দিলেই রামকৃষ্ণবাবু মাতাজীর মুখ দেখতে পেতেন, কিন্তু সে-রকম কোন আগ্রহ হলো না।

www.bengaliebook.com

চেলা মন্দিরের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। দক্ষিণভারতে বহু মন্দির কল্পনাতীত স্থপতিমাহাত্ম নিয়ে দাঁড়িয়ে। রামেশ্বরের মন্দিরও তার ব্যতিক্রম নয়। এর করিডরটিই শুনেছি চার হাজার ফুট।

পুরী বারাণসী গয়াধাম ইত্যাদি দ্বাদশ কূপের চব্বিশ বালতি মিঠে জল তার মাথায় ঢাললো পাণ্ডার চেলা। স্বচ্ছ জল, ভালো লাগল। তারপর সেই ভিজে জামা-কাপড়ে চল্লিশ মিনিট লাইনে দাঁড়ানোর পর দর্শন এবং পূজো শেষ।

গায়ে ভিজে জামা-পাজামা, খালি পা, বাইরে মাটি তেতে আছে, মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে। এবারে একটু ক্লান্ত বোধ করছেন রামকৃষ্ণবাবু। চেলার সঙ্গে চাতালে এসে উঠলেন আবার–সেখানেই শুকনো জামা-কাপড়। কোণের মাতাজীর সামনে জনাতিনেক লোক তখন। রমণী এদিকেই চেয়ে আছেন–সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে রামকৃষ্ণবাবু আড়চোখে তাকালেন একবার–কালোকুলো মুখের একপাশ দেখতে পেলেন। রমণী তার দিকেই চেয়ে আছেন মনে হল, কিন্তু রামকৃষ্ণবাবুর তখন ঘরে ফেরার তাড়া। সোজা চাতালের আড়ালে চলে গেলেন। জামা-পাজামা বদলে ভিজেগুলো হাতে তুলে নেবার আগে একজন স্থানীয় লোক এসে চেলাটির কানে কানে কি বলতেই। সে ব্যস্তসমস্ত মুখে চলে গেল।

রামকৃষ্ণবাবু সোজা চাতাল থেকে নেমে এলেন। চেলার প্রাপ্য সে আগেই পেয়েছে। মাতাজীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে সে কথা বলছে। মাথায় কাপড় তোলা মাতাজীর কালো মুখের একটু আভাস মাত্র পেয়েছেন। তা দক্ষিণভারতে রূপসী রমণীর দর্শনলাভ একটা বিরল, ব্যাপার।

বিকেলে আবার বেড়াবার জন্য রাস্তায় নামলেন। পায়ে পায়ে টাঙ্গা আর টমটম ঘেঁকে ধরছে–এখানকার যাত্রীদের পাঁচ পা হাঁটতে দেখলেও ওরা বরদাস্ত করতে চায় না। সমুদ্র বা মন্দিরের দিকে এগোতে মালা-অলা আর শাক-অলারাও সঙ্গ নিতে ছাড়ে না।

–রামঝরুক্কা–বাবুজী রামঝরুক্কা চলিয়ে!

www.bengaliebook.com

কম করে দশটা টাঙ্গাঅলার মুখে এই একই হাঁকডাক শুনলেন রামকৃষ্ণবাবু। রামঝরুক্কা কি ব্যাপার বোধগম্য হল না।

এক ছোকরা টাঙ্গাঅলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রামঝরুক্কা কেয়া হ্যায়?

সাগ্রহে টাঙ্গা থেকে নেমে এসে ও বলল, রামজীকো চরণ দর্শন হোগা, নসিব হো তো মাতাজী কো গানা ভি শুনিয়েগা–আই-এ সাব, বৈঠিয়ে।

উঠে বসেই পড়লেন।

দুদিকের তেঁতুল-সারির মাঝখান দিয়ে সুন্দর পাকা রাস্তা। মাইল তিনেক বাদে। রাস্তাটা একেবারে সমুদ্রের সামনে এসে থেমেছে। সামনে একতলা সমান প্রশস্ত বাঁধানো চাতাল, তার ও-পাশে একতলার মতো সিঁড়ি ভাঙলে মন্দির।

চাতালের সামনে সাইনবোর্ড টাঙানো। সেটা পড়ে হাসিই পেয়ে গেল। জায়গা বা মন্দিরের নাম হল রামজী রুককা। অর্থাৎ সীতা অন্বেষণের পথে রামজী এখানে থেমেছিলেন। এখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের অপর প্রান্তে স্বর্ণলঙ্কার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন।

মন্দিরে উঠলেন। চারদিকে রেলিং-ঘেরা বাঁধানো চাতালের মাঝখানে ছোট মন্দির। সেখানে রামজীর পাষাণ-চরণচিহ্ন। সেই দর্শন সারতে এক মিনিটও লাগে না। চাতালের চারদিকে ঘুরে সমুদ্র দেখাটা সত্যিই লোভনীয়। সেই উদ্দেশ্যে সবে দরজা দিয়ে। বেরিয়েছেন–সেখানকার একজন লোক তার কাছে এসে সবিনয়ে জানালো, মাতাজী বোলাতে।

এ আবার কি বিড়ম্বনা রে বাবা! মাতাজী তাকে ডাকেন কেন? গানের সমজদার ভেবেছেন নাকি? চারদিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কঁহা মাতাজী?

মন্দিরের পিছনটা দেখিয়ে লোকটা তাকে রেলিংঘেরা চাতাল ধরে পিছনদিকে নিয়ে চলল।

লালপেড়ে শাড়িপরা সকালের সেই রমণী বসে। সোজা সামনের দিকে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে মুখ। পিছন থেকে কালো দেহের আঁট-বাঁধুনী দেখে খুব বেশি বয়েস মনে হল না মাতাজীটির। ইনি ওখানে বসে রামকৃষ্ণবাবুর এইস্থানে আগমন টের পেয়ে লোকমারফৎ ডেকে পাঠালেন কি করে? হয়তো আসার সময় দেখে থাকবেন!

নমস্তে।

–নমস্কার। বোসো। বলতে বলতে তার দিকে ঘুরে তাকালেন মাতাজী।

সেই মুহূর্তে মাথার মধ্যে এই পৃথিবীটাই বুঝি উল্টেপাল্টে যেতে লাগল রামকৃষ্ণবাবুর। কিন্তু বাইরে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেলেন। বিস্ফারিত চোখে দেখছেন। দেখার পরেও বিশ্বাস করবেন কি করবেন না জানেন না।...তেইশ বছরের একটা মেয়ের মুখে চোখে সর্ব অঙ্গে তিরিশটা বছর জুড়ে দিলে কি দাঁড়ায়? কেমন দাঁড়ায়? অথচ আশ্চর্য, এঁর সামনে এসে দাঁড়ালে, ভালো করে একটু তাকালে, তিরিশ বছর আগের সেই তেইশ বছরের মেয়েকে চিনতে একটুও সময় লাগে না। রামকৃষ্ণবাবুরও সময় লাগল না। তিনি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

মাতাজী এবারে খানিকটা ঘুরেই বসলেন তার দিকে। হাসিমাখা স্নিগ্ধ মুখ।...তিরিশ বছর আগে ওই মুখে সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটা ছিল না, আজও নেই। কিন্তু সেদিনও মুখের হাসিটুকু ভালো লাগত, আজ সেটা স্নিগ্ধ কমনীয় লাগছে।

–চিনতে পারছ না?

দাঁড়িয়ে থাকার দরুন মাথার চুল আরো বেশি উড়ছে রামকৃষ্ণবাবুর। মাথা নাড়লেন। পারছেন।

সামনের ঝকঝকে মেঝে দেখিয়ে মাতাজী বললেন, তাহলে বোসো–সকালে রামেশ্বরের ঘাটে দেখার পর থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

বাহ্যজ্ঞানরহিতের মতো রামকৃষ্ণবাবু বসলেন। চেয়েই আছেন মুখের দিকে। এভাবে সামনে বসতে, মুখের দিকে চেয়ে থাকতে এ-বয়সে কোনো দ্বিধা বা সংকোচ থাকার কথা নয়। তার ওপর ইনি মাতাজী এখানকার। শ্রীরামচন্দ্রের চরণদর্শনে যারা আসছে, অলিন্দ ঘুরে তারা একবার মাতাজীকেও দর্শন করছে–তফাতে দাঁড়িয়ে দুহাত জুড়ে প্রণাম করে চলে যাচ্ছে। হয়তো তাঁর নির্দেশেই মন্দিরের ভক্ত দুটি আপাতত কাউকে কাছে আসতে দিচ্ছে না।

মুখের ওই হাসি এখন আরো অদ্ভুত লাগছে রামকৃষ্ণবাবুর।... তার থেকে চার বছরের ছোট, অর্থাৎ তিপ্পান্ন হবে বয়েস এখন। তেতাল্লিশও দেখায় না। কালো মুখের চামড়ায় যেটুকু ভাজ পড়েছে তাও জরার দাগ মনে হয় না। দুই ঠোঁটের নিঃশব্দ হাসি দুই গালের দিকে ছড়িয়ে ওই ভঁজের মধ্যে পড়ে যেন অদ্ভুত চিকচিক করছে।–তারপর উপচে উঠে চোখের কালো তারার দিকে ধাওয়া করছে। বাতাসে বিশৃঙ্খল হয় বলেই হয়তো চুলের বোঝা টান করে পিছনে এসে গোড়ায় শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। বন্ধনীর নীচে একপিঠ চুল কোমরের নীচ পর্যন্ত তাণ্ডব জুড়ে দিয়েছে। কান দুটো চুলে ঢাকা পড়েনি, ওই হাসি যেন শেষে কানের ডগা পর্যন্ত ছড়িয়েছে।

খুব হালকা সুরে বললেন, এ জায়গাটার মাহাত্ম আছে, একদিন রামচন্দ্র রুকেছিলেন এখানে, আজ রামকৃষ্ণ রুকলেন।

রামকৃষ্ণবাবু বলতে পারতেন, রামচন্দ্র সীতা-সন্ধানে এসেছিলেন, রামকৃষ্ণের কোনো হারানো-প্রাপ্তির প্রত্যাশা নেই।

কিছুই বললেন না। চেয়ে আছেন। দেখছেন।

রামেশ্বরের ঘাটে দেখলাম বেশ ধর্মেকর্মে মতি হয়েছে।...একবার ফিরেও তাকালে না।

রামকৃষ্ণবাবু আত্মস্থ করলেন নিজেকে। এ-রকম বিড়ম্বনা ভোগ করার তার অন্তত কোনো কারণ নেই! জবাব দিলেন, কলকাতার শুভা গাঙ্গুলী

এখানে মাতাজী হয়ে বসে থাকতে পারেন, এটা কোনো কল্পনার মধ্যে ছিল না—

রমণীর মুখে সেই অদ্‌ভুত সুন্দর নিঃশব্দ হাসিটা আরো যেন বেশি উপচে পড়ছে।–তাছাড়া চেহারাটাও ফিরে তাকানোর মতো নয়।

কেন যে হঠাৎ আবার বিব্রত বোধ করছেন রামকৃষ্ণবাবু, জানেন না। কোনো একদিন দেখা হলে কৈফিয়ত তো তারই নেবার কথা। ঘরে আর একজনকে আনার পরেও এই এক রমণীকে দীর্ঘদিন ভুলতে পারেন নি। ভুলবেন কি করে, নিরুদ্দেশ হবার পরেও কম করে তিন চার বছর রেডিওতে আর রেকর্ডে তার গান বাজার কামাই নেই। তারপর অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই বিস্মৃত হয়েছেন।

যে লোকটি তাকে মাতাজীর কথা বলে এদিকে নিয়ে এসেছিল, সে অদূরে এসে দাঁড়াল। তাদের মাতাজী সপ্রশ্ন চোখে তাকাতে সে জানান দিল, টাঙ্গাঅলা বাবুজীকে ডাকছে।

স্পষ্ট হিন্দীতে মাতাজী নির্দেশ দিল, আমার নাম করে তাকে বলে দাও অনেকক্ষণ বসতে হবে–বাবু ডবল ভাড়া দেবেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ঝুলিয়ে তার চোখে চোখ রেখে দেখলেন একটু।–তোমার তাহলে তিন ছেলে আর এক মেয়ে এখন?

ঈষৎ বিস্ময়ে মাথা নাড়লেন রামকৃষ্ণবাবু- তাই।

-না, মন্ত্রতন্ত্র কিছু জানি না, যে পাণ্ডার মারফত ওদের কল্যাণে পুজো দিলে তার কাছে শুনলাম!...তা একা তীর্থে এলে, স্ত্রীকে নিয়ে এলে না কেন?

–তিনি অনেক বড় তীর্থে চলে গেছেন।

মহিলা থমকালেন একটু।–কতদিন আগে?

–বছর দেড়েক।

শুভ গাঙ্গুলী ছোট নিঃশ্বাস ফেললেন একটা।ভাগ্যবতী বলতে হবে। ...ছেলেমেয়েদের সব বিয়ে-থা হয়ে গেছে?

মাথা নাড়লেন– হয়েছে।

–তারা কেমন?

–ভালো।

-এ বয়সে একলা তোমাকে তীর্থ করতে ছেড়ে দিলে?

–তীর্থে বেরোইনি আমি–মাদ্রাজ থেকে হঠাৎ ঘোরাঘুরির নেশায় পেয়ে বসেছে।

ভিতরটা ভয়ানক উসখুস করে উঠছে রামকৃষ্ণবাবুর। কৈফিয়ত চাইবার সময় আর প্রয়োজন বহুকাল আগে ফুরিয়েছে। এখন শুধু কৌতূহল একটু।...প্রতিশ্রুতি ভুলে, ভবিষ্যৎ ভুলে, গান ফেলে তিরিশটা বছর আগে শুভ গাঙ্গুলী হঠাৎ কার সঙ্গে ওভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছল, আর এখন সেই মানুষের খবর কি- ঠোঁটের ডগায় বার বার এই প্রশ্নটাই আসছে শুধু।

..তিরিশটা বছর অনায়াসে চোখের সামনে থেকে সরে গেছে রামকৃষ্ণবাবুর। তিরিশটা কেন, তারও ঢের বেশি।

. ...ন'দশ বছর বয়েস থেকেই নিজের কালো কুৎসিত বয়েস সম্পর্কে সজাগ ছিল একটা মেয়ে। তার নাম শুভাশুভ গাঙ্গুলী। রামকৃষ্ণবাবুর দিদির ভাসুরের মেয়ে। মধ্যবিত্ত অবস্থার মানুষ। সেই কুৎসিত মেয়েটা এমন কিছু গুণের অধিকারিণী হতে চেয়েছিল, যার আলোয় রূপের খেদ ঢাকা পড়ে যেতে পারে।

...সেরকম গুণের অধিকারিণী হতে পেরেছিল। গান- চৌদ্দ বছর বয়সে তার গানের প্রথম রেকর্ড হয়। তেইশ বছরের মধ্যে তার রেকর্ডের ছড়াছড়ি। বড় বড় সব জলসা থেকে ডাক আসে, সিনেমায় প্লে-ব্যাকের

ডাক আসে। শেষের দুটো বছর রেকর্ড আর প্লে-ব্যাকের দরুন অবিশ্বাস্য টাকা এসেছিল সেই মেয়ের হাতে।

..আর যে ছেলেটার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে তার হৃদ্যতা, তার নাম রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী। শুভার মা নেই, ভাসুর-ভাসুরঝির বাস দিদির কাছেই।...ওই মেয়ে তার লেখক জীবনের প্রথম প্রেরণা। তার সঙ্গে প্রতিটা লেখা নিয়ে কত আলোচনা, কত মতভেদ।

নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে ওই মেয়েকেই বিয়ে করবেন স্থির করে ফেলেছিলেন রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

...বাইরেটা কুৎসিত কিন্তু ভেতর তো সুন্দর। চোখ বুজে গান শোনে যখন, স্থান কাল ভুল হয়ে যায়।...তা ছাড়া বয়সেরও একটা রূপ আছে, সেই রূপই চোখে ধরে রাখতে চেষ্টা করে। শুভার গানের কদর চারদিকে যতো বাড়ছে– রূপের প্রশ্নটা ততো গৌণ ভাবতে চেষ্টা করেছেন রামকৃষ্ণ।

কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গে মেয়েটা হাসে শুধু। হাঁ-না কিছুই বলে না। কালো মুখে রঙের ছোপ লাগে সেটা অবশ্য রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর চোখ এড়ায় না। ওদিকে গানের টাকা আসছে–ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে- রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী অন্তত চারজনকে জানেন, যাদের যে-কোনো একজন শুভার একটু চোখের ইশারা পেলে বিয়ে করে তাকে সাদরে ঘরে তুলে নিয়ে যাবে। রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী ঠাট্টা করে ওদের নিয়ে। শুভ গাঙ্গুলী হাসে খুব। বলে, স্টুডিওতেও জনাতিনেক আছে যারা পাগল করে ছাড়লে!

মনস্থির করে ফেলার পরেও ওই মেয়ের সাড়া না পেয়ে ভিতরে ভিতরে রামকৃষ্ণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। অথচ মেয়েটা যে তার আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে সেই। আভাসও পেয়েছেন। গানের জন্যে যে মেয়েকে সাধ্যসাধনা করতে হয়, সেই মেয়ে নিরিবিলিতে তাঁকে দশখানা গান শোনাতেও আপত্তি করে না।

...ছেলেটার সাতাশ আর মেয়েটার তেইশে এক বিপর্যয় ঘটে গেল। ওই মেয়ে প্রশ্রয় না দিলেও প্রেমিকের সংখ্যা বাড়ছে দেখে ছেলেটার ইদানীং মেজাজ চড়া প্রায়ই।

বৃষ্টিতে কলকাতা ভেসে যাচ্ছিল সেই রাতে। দিদি-জামাইবাবু কোথাও বেরিয়ে আটকে গেছেন বোধহয়। তিনতলার ঘরে চোখ বুজে একের পর এক গান শুনে যাচ্ছিলেন রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী। এক-একটা গান শেষ হলে শুভার চোখে চোখ মেলছিলেন। হঠাৎ উঠে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল ছেলেটা। শুভার মুখে শংকা, চোখে বিস্ময়।–কি?

রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী এগিয়ে এলেন। খুব কাছে। তানপুরা সরিয়ে দিলেন। তারপর শক্ত দুই হাতে একেবারে বুকের ওপর টেনে আনলেন ওকে। আমাদের বিয়ে হবে কি হবে না?

– ছাড়ো, আঃ!

বাধা পড়ল। দুটো পুরু ঠোঁটের মধ্যে শব্দটা হারিয়ে গেল। অসহিষ্ণু তাড়নায় মেয়েটাকে, বুঝি গ্রাস করে ফেলবেন।–বিয়ে হবে কি হবে না?

সমস্ত মুখে বেগুনে রং শুভার। কাঁপছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে। –কি করছ! ছাড়ো, কেউ এসে গেলে–

আবার আসুরিক বাধা পড়ল। তারপর আবার সেই প্রশ্ন। আমাদের বিয়ে হবে কি হবে না?

হাল ছেড়ে ওই মেয়ে কালো টানা-টানা দুই অসহায় চোখ তার মুখের ওপর রাখল।–হবে। ছাড়ো।

এই ঘটনার ঠিক পাঁচদিনের মাথায় ওই মেয়ে নিখোঁজ।...যে চারটে ছেলে তার প্রত্যাশায় বাড়িতে আসত, তাদের দেখা মিলেছে। রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী আর তাদেরও ধারণা, স্টুডিওরই কোনো একান্ত গুণগ্রাহীকে নিয়ে শুভ গাঙ্গুলী উধাও হয়েছে। দিদির মুখে শুনেছে, যাবার আগে ওই পাঁচদিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে নিজের নামের সব টাকাও তুলে নিয়ে গেছে।

....তিরিশ বছর বাদে এই দেখা।

রামকৃষ্ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখছ?

তেমনি হাসিমুখে মহিলা জবাব দিলেন, তোমাকেই দেখছি।... তিরিশটা বছর কেটে গেল, এ যেন বিশ্বাস হয় না, মনে হয় সব সেদিনের কথা। চোখ বুজে তোমার সেই গান শোনা আজও যেন চোখের সামনে দেখছি।

রামকৃষ্ণবাবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। পুরনো দিনের স্মৃতির শুধু এটুকুই চোখে ভাসার কথা নয়।

রমণীর কালো মুখে খুশিভরা কৌতুক।–আচ্ছা, তোমার বউ রূপসী ছিলেন নিশ্চয়?

–রূপসী না হোক, মোটামুটি ভালোই ছিলেন দেখতে। জবাবটা দিতে পেরে মনে মনে খুশী হলেন রামকৃষ্ণবাবু।

মুখ টিপে হাসছেন মহিলা। আবার কি মনে পড়ল হঠাৎ। মুখে সেই রকমই কৌতুকের মিষ্টি ছটা–আর তোমার পরের সব বইয়ের নায়িকারাও কি প্রায় সুন্দরী নাকি?

এবারে আর রামকৃষ্ণবাবু জবাব দিলেন না। ভিতরে ভিতরে কেন যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন জানেন না। পুরনো স্মৃতি সবই মুছে গেছল, তিরিশ বছর বাদে আবার সেটা তাজা করে তোলার ব্যাপারে কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। ভিতরে তার একটাই কৌতূহল। শুভ গাঙ্গুলীকে আজ তিনি এখানে এই বিজনে এ অবস্থায় দেখছেন কেন? অথচ কালো মুখের ওই হাসির সঙ্গে যেন সত্তার যোগ-পিছনে যা ফেলে এসেছেন। তার জন্যে যেন এতটুকু খেদ নেই, ক্ষোভ নেই।

প্রশ্নের সুযোগ মহিলাই দিলেন। বললেন, এতকাল পরে দেখা, আমার কোনো। খবর জিজ্ঞাসা করলে না তো?

–জিজ্ঞাসা করলে বলবে?

–ওমা, না বলার কি আছে!

–এই জীবনে অভ্যস্ত হতে তোমার কতদিন লেগেছে?

–বেশি দিন না। গানের কল্যাণে ভারী সহজেই সব সয়ে গেল।

–অর্থাৎ যার জন্যে তোমার এতখানি আত্মত্যাগ, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই তোমাকে ছেড়ে গেছেন?

জবাব দিলেন না। রামকৃষ্ণবাবুর আবার মনে হল, কালো মুখের তলায় তলায় আবার সেই বিচিত্র হাসির উৎসমুখ যেন খুলে গেছে। কালো ত্বকের ভিতর দিয়ে সেই হাসির তরঙ্গও বুঝি দুচোখ মেলে দেখার মতো।

-জবাব দিলে না! রামকৃষ্ণবাবু বললেন, তবু আরো একটু কৌতূহল আমার –আমাদের সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে যে মানুষটিকে সেদিন অনুগ্রহ করেছিলে তাকে কি আমি চিনি?

সমস্ত মুখেই হাসি চিকচিক করছে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে রামকৃষ্ণবাবুর। এবারে মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়লেন মহিলা– অর্থাৎ চেনেন।

-নাম বলবে না বোধ হয়?

–বললে কি করবে, তিরিশ বছর বাদে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ছুটবে?

–না, শুধু জানার ইচ্ছে। আর সত্যিই তুমি সুখী কিনা!

কালো মুখে সেই হাসির নিঃশব্দ তরঙ্গের ছেদ নেই। হাসিমাখা দুই চোখ তার। চোখের ওপর অপলক কৌতুকে স্থির হয়ে আছে। তেমনি মিষ্টি স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর মহিলার। বললেন, তার নাম রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী–যে ভদ্রলোক চোখ বুজে আমার গান। শুনত আর কল্পনার জোয়ারে ভাসত, যার গল্পের নায়িকারা সকলেই সুন্দরী, আর যে ভদ্রলোক আমাকে ছেড়ে আমার গানকে বিয়ে করার জন্য একেবারে ক্ষেপে উঠেছিল! আমি সরে এসে

তাকে রক্ষা করতে পেরেছি, নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছি। –আমার মতো সুখী কে আছে!

মুহূর্তের মধ্যেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা তোলপাড় কাণ্ড ঘটে গেল বুঝি রামকৃষ্ণবাবুর ভিতরে ভিতরে। তারপর নির্বাক, নিষ্পন্দ, বিমূঢ়, একেবারে।

কালো মুখের হাসির আলো মিলায়নি একটুও। ঈষদুচ্চ স্নিগ্ধ গলায় ডাকলেন, লছমন!

স্থানীয় সেই লোকটি এগিয়ে এলো।

মহিলা সুন্দর হিন্দীতে বললেন, বাবুজী যাবেন এখন, অন্ধকার হয়ে আসছে, সঙ্গে গিয়ে টাঙ্গায় তুলে দিয়ে এসো।

কথার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, হাসির তরঙ্গ কমেছে, কিন্তু সমস্ত মুখে তার কমনীয় রেশ ছড়িয়ে আছে। বললেন, ভজনের সময় হল, আমার আর বসার জো নেই

যন্ত্রচালিতের মতো উঠলেন রামকৃষ্ণবাবুও। বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে আছেন তেমনি। চোখে পলক পড়ে না।

...শুভ গাঙ্গুলী তিরিশ বছর আগে মুছেই গেছে।

সামনে যাকে দেখছেন তিনি মাতাজী।

বাঘিনীর নিঃশব্দ গর্জন

আজও গ্রামই দেখবেন লোকনাথবাবু ভাবেননি।

তেত্রিশ বছর আগে বরং এই বর্ধিষ্ণু গ্রামে শহরের কিছু ছাঁদছিরি এসেছিল। এখানকার কাঠের ব্যবসা ফলাও হয়ে উঠেছিল। দূরের মানুষদের আনাগোনা বেড়েই চলেছিল। ফলে তখনই এর থেকে ঢের বেশি চেকনাই দেখা গেছল। তেত্রিশ বছর বাদে এখানে পা দিয়ে লোকনাথবাবুর কেবলই মনে হতে লাগল–সমস্ত গ্রামটা যেন ভয়ানক বুড়িয়ে গেছে আর

আফিমখোরের মতো ঝিমুচ্ছে। শুধু তাই নয়, এখানে দিনকতক কাটালে এখানকার জরা বুঝি তাকেও ঘেঁকে ধরবে।

অথচ দিনকয়েক এখানে থাকার বাসনা নিয়েই এসেছেন লোকনাথবাবু। জীবনের প্রথম বিশটা বছর এই জায়গার সঙ্গে নিবিড় যোগ তার। যদিও বছরের বেশির ভাগ সময়েই দূরের শহরে কাটাতে হত তাকে। এই দশা হলেও এখানে নাকি হাই স্কুল আছে একটা। তখন প্রাইমারী স্কুল ছিল। সেখান থেকে বৃত্তি পাওয়ার ফলে কাকা উদার হয়ে কাকীমার অমতে শহরের হাই স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিলেন তাকে। কাকীমার। ইচ্ছে ছিল, নিজের ছেলেকেই শুধু শহরের স্কুলে পড়তে পাঠান, একসঙ্গে দুজনকে বোর্ডিং-এ রেখে পড়ানোর সংগতি কোথায়? ভাসুরপো বরং বাবুদের কাঠের গুদামে বা জঙ্গলের কাজে লেগে যাক।

কাকা অনেক কারণে চক্ষুলজ্জায় পড়েছিলেন। প্রথম কারণ, মরার আগে লোকনাথবাবুর বাবা কাকার হাতে কিছু টাকাকড়ি তুলে দিয়ে গেছলেন। আর মাতৃহীন ছেলেটাকে মানুষ করার আকৃতি জানিয়ে গেছলেন। দ্বিতীয় কারণ, কাকার আগে লোকনাথবাবুর বাবাই কর্তাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। বাবা অকালে মারা যেতে তার জায়গায় কাকা জাঁকিয়ে বসেছেন। এই কাকাকে বুড়ো কর্তামশাই খুব একটা সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু অতিবৃদ্ধ তিনি তখন, আর তার তিন ছেলের মধ্যে মেজ আর ছোটই সর্বব্যাপারে মাতব্বর তখন। বড় ছেলেই বাপের এত বড় কাঠের ব্যবসা আর জঙ্গল তত্ত্বাবধানের প্রধান সহায় ছিলেন। সেই ছেলে শিকারে বেরিয়ে বাঘের থাবার ঘা নিয়ে ফিরলেন। তারপর একটু একটু করে দেহ বিষিয়ে চোখ বুজলেন। সেই শোক তার বৃদ্ধ বাপ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি। লোকনাথবাবুর কাকা ওই ছোট দুই ছেলের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন, একসময়। তাদের অনেক রকমের হুকুম তামিলের মানুষ ছিলেন। তাই লোকনাথবাবুর বাবা চোখ বুজতে কাকাকেই তার বাবার জায়গায় বসিয়ে দিলেন। সেই জায়গার গালভরা নাম হল ম্যানেজার। কিন্তু আসলে গোমস্তা। লোকনাথবাবুর বাবা বুড়ো কর্তার স্নেহের ভাগীদার ছিলেন, কিন্তু কাকা শুধুই গোমস্তা। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। তেত্রিশ বছর আগে সেটা একেবারে কম কিছু নয়। কিন্তু বুঝে-শুনে চলতে পারলে আরো অনেক

www.bengaliebook.com

দিকে আয়ের পথ খোলা ছিল। সে-রকম বুঝেশুনে চলার বুদ্ধিও কাকার ছিল। তবু ভাইপোর বাবার জায়গায় তিনি বসেছেন, এটা বোধহয় ভুলতে পারেন নি।

তৃতীয় কারণ, চক্ষুলজ্জা। নিজের ছেলেটা কোনরকমে প্রাইমারী পাশ করেছে, তাকে শহরের স্কুলে পড়তে পাঠাবেন আর জলপানি পাওয়া ভাইপো এখানে বসে থাকবে, শুনলে কর্তাবাবুরাই বা বলবেন কি? বাইরের পাঁচজনের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল।

আর ভাইপোকে শহরের স্কুলে পড়তে পাঠানোর শেষ কারণ সম্ভবত ভবিষ্যতের আশা। নিজের ছেলেকে দিয়ে সেরকম আশা করেননি। ভাইপো যদি লেখাপড়া শিখে একটা পাশ দিয়ে বিদ্বান হয়ে আসতে পারে, তাহলে কর্তাবাবুদের এতবড় বিষয় আশয়ের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব ঢের বাড়বে। ওঁর ভাইপো কোনদিন তার অবাধ্য হতে পারে সেটা কল্পনার বাইরে। অতএব ভাইপোকে বিদ্বান করে সুখে কাল কাটানোর একটা স্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন হয়তো।

বয়সে বছর পাঁচেকের বড় এক দিদি আছেন লোকনাথবাবুর। বাবা সেই দিদির ভালো বিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। লোকনাথবাবু আর কাকার ছেলে মন্মথ সমবয়েসী। দুই এক মাসের তফাত। দুজনেই ভঁরা শহরের স্কুলে পড়তে চলে গেছলেন। পূজো আর গ্রীষ্মের বড় ছুটিতে তো বটেই– একসঙ্গে পাঁচটা দিনের ছুটি পেলেও মন্মথকে পট্টি পরিয়ে দেশের বাড়িতে চলে আসার জন্য ছটফট করতেন। লোকনাথবাব। গাঁটের পয়সা ভেঙে একা আসাটা কাকা-কাকীমা বরদাস্ত করবেন না, তাই মন্মথকে চাই। মন্মথর কিন্তু শহর ছেড়ে আসার ঝোঁক পরের দিকে তেমন ছিল। না। লোকনাথ বরাবরই ছুটে চলে আসার জন্য পাগল। এখানকার আকাশ বাতাস। নদী জঙ্গল পাহাড় সব ভালো লাগত তার। এরা যেন হাতছানি দিয়ে সর্বদা ডাকত তাকে।

…আজ তেত্রিশ বছর বাদে সেইখানেই এসেছেন। এসে যেন পায়ে পায়ে ঠোক্কর খাচ্ছেন।

কাকা তো অনেককাল বিগত। মন্মথও নেই। তার ছেলেরা এখানে ছোটখাট কাঠের কল দিয়ে বসেছে একটা। শহরের সঙ্গে যোগাযোগও এত বছরে আগের থেকে ঢের সহজ হয়েছে। লরি আর বাস চলার পাকা সড়ক হয়েছে। উঠতি মানুষেরা শহরের দিকেই ছুটেছে। সেখান থেকে আরো দূরে দূরে গেছে। ফলে যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বেড়েছে অথচ শহর গ্রামের দিকে এগিয়ে আসেনি, গ্রামের। প্রাণ শহরের দিকে ধাওয়া করেছে।

লোকনাথবাবুর বাস এখন কলকাতায়। কম করে সাড়ে তিনশ মাইল দূর। এখান থেকে। কর্মজীবনে ভারত সরকারের চাকরি নিয়ে বহু জায়গায় ঘুরেছেন। এখন কলকাতায় বহাল আছেন। বয়েস এখন তিপ্পান্ন তার। চাকরির মেয়াদ আরো পাঁচ বছর। পদস্থ ব্যক্তি তিনি। কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি। মন্মথর বড় দুই ছেলে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল। বিশ বছর বয়সে দেশছাড়া লোকনাথবাবু আর ও-মুখো হননি, মন্মথ বিয়ে করেছে কি করেনি এ খবরও তার জানা ছিল না। ছেলেদের চেনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কোথা থেকে কেমন করে তার আপিসের ঠিকানা সংগ্রহ করে তারা এক দুপুরে সেখানে এসে হাজির। ওদের পরিচয় পেয়ে লোকনাথবাবু আদর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। একটা সস্তার হোটেলে উঠেছিল, সেখান থেকে ওদের তুলে এনে নিজের কাছে রেখেছিলেন কটা দিন। এত বড় মানী জ্যাঠার (মন্মথর থেকে লোকনাথবাবুই মাস দেড় দুইয়ের বড় ছিলেন) আন্তরিক আদরযত্নে ছেলে দুটো মুগ্ধ। ওদের মুখেই লোকনাথবাবু খবর পেলেন মন্মথ আর নেই। মা আছেন। বাবার কাঠের কল এখন ছেলেরা চালাচ্ছে। মন্মথর তিন ছেলে। ছেলেরা নাকি তাদের বাবার মুখে এই জ্যাঠার গল্প অনেক শুনেছে। লোকনাথবাবুর বড় চাকুরে হবার কথা মন্মথর জানা অস্বাভাবিক নয়। দেড় বছর আগেও লোকনাথবাবুর দিদির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল।

যাবার আগে ওই দুই ছেলে বার বার তাকে অনুরোধ করেছিলো একবারটি তিনি যেন দেশে আসেন। লোকনাথবাবু কথা দিয়েছিলেন

যাবেন।...এখানকার এই আকাশ বাতাস নদী পাহাড় জঙ্গল প্রায় তিন যুগ বাদে আবার তাকে ডেকেছে, হাতছানি দিয়েছে। এর কারণ ওই ছেলেদের জানার কথা নয়। প্রথম সুযোগে তিনি চলে এসেছেন।

মন্মথর বউ আর ছেলেরা তাকে পেয়ে মহা ব্যস্তসমস্ত। তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সক্কলের বিশেষ নজর। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তিন ছেলের একজন না একজন ছায়ার মতো তার সঙ্গে লেগে আছে। শেষে নিরুপায় হয়ে লোকনাথবাবু বলেছেন, এ জায়গার সবকিছু আমার বড় চেনা, আমি নিজের মনে দু-চারদিন বেশ বেড়াব–আমার জন্যে তোমরা নিজেদের কাজের ক্ষতি কোরো না।

মানী জ্যাঠার মন বুঝে ছেলেরা কিছুটা অব্যাহতি দিয়েছে তাকে।

...তেত্রিশ বছর আগে তারা যেখানে থাকতেন মন্মথর ছেলেরা এখন আর সেখানে থাকে না। ওদের বাবাই নাকি এখানে এই কাঠের বাড়ি করে রেখে গেছে।

এখানে এসে এক ঘণ্টার মধ্যে লোকনাথবাবু তাঁদের আদি বাসস্থান দেখতে গেছলেন মন্মথর বড় ছেলেকে নিয়ে। দেখে হতভম্ব তিনি।... তাদের সেই কাঠের দালান প্রায় নিশ্চিহ্ন। চারদিক জঙ্গলে ছেয়ে আছে। অদূরে কর্তাদের সেই চকমিলাননা দালানেরও প্রায় সেই অবস্থা। সমস্ত গাঁয়ের মধ্যে ওটাই ছিল একমাত্র তিন-মহলা দালান। ভাঙা জীর্ণ একটা কংকাল শুধু দাঁড়িয়ে আছে। সেটার নানা দিক খসে ধসে পড়ছে। সর্বাঙ্গে পুরু শ্যাওলা জমে আছে। বাড়িটার পিছনের দিকে ছিল মস্ত একটা দীঘি। দীঘিটাও কর্তাদেরই ছিল, কিন্তু ওই বাড়ির আঙিনার বাইরে ছিল ওই দীঘি। বাড়ির মুখোমুখি ঘাটটা বাবুদের নিজস্ব–অন্য দিকের ঘাট দুটো কর্তাদের পোষ্য এবং অনুগ্রহভাজনেরা ব্যবহার করতে পারত। ঘাটের তিনদিকেই বেশ সাজানো গাছের সারি ছিল। বাবুদের ঘাট–তাই বাবুঘাট ছিল ওটার নাম।

পায়ে পায়ে ঘাটের দিকে এলেন লোকনাথবাবু। চোখে কাটা বিঁধল যেন। চারদিক জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল ছিল, এখন সেই

জল একেবারে তলায় এসে ঠেকেছে-তার ওপর যেন সবুজ সর পড়ে আছে একটা। দেখলেই বোঝা যায় কেউ আর এখন এই জল ছোঁয় না। বাঁধানো সিঁড়িগুলোও ভেঙে ফেটে চৌচির হয়ে আছে।

লোকনাথবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার, দেবরায়দের কোনো বংশধরও আর এখানে থাকে না?

মন্মথর বড় ছেলের নাম সুবল। সে বলল, না, মাত্র বছর পাঁচেক আগে বাড়ি-ঘর, বিষয়আশয় সব বেচে দিয়ে তারা এখান থেকে চলে গেছেন। এই বাড়ি আর জায়গা-জমি কি সব কাজে লাগানো হবে বলে সরকার কিনে নিয়েছিল, কিন্তু কিছুই হয় নি, তেমনি পড়ে আছে।

–মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে এই দশা?

সুবল বলল, খারাপ দশা অনেক আগেই শুরু হয়েছিল–ভাগের মা গঙ্গা পায় না, বাড়ি-ঘরদোর কে দেখে! কর্তাদের দুভাইয়ের মিল ছিল খুব, দুজনে একসঙ্গেই নেশা-টেশা করত, কিন্তু তাদের ছেলেদের মধ্যে বনিবনা ছিল না একটুও-বউদের মধ্যেও না। তবু কর্তারা বেঁচে ছিলেন বলে তখনো খাওয়া-খাওয়ি শুরু হয়নি, আর ব্যবসাপত্রও চালু ছিল। ছেলেপুলেসুদ্ধ সেই ডাকাতের হাতে পড়ার পর রাতারাতি অতবড় ব্যবসা অর্ধেক হয়ে গেল, তারপর কিছুদিনের মধ্যে

লোকনাথবাবু অবাক।–ছেলেদেরসুদ্ধ কর্তারা ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন নাকি? কোথায়?

সুবল সোৎসাহে বলল, ও, আপনি তো কিছুই জানেন না–সে এক তাজ্জব কাণ্ড! সেও বছর ছয় আগের কথা, মাসে তখন বুড়ো কর্তারা একবার করে জঙ্গলে যেতেন আদায়পত্র দেখাশুনা করতে। নেশার কল্যাণে তখন ইজারার একটা জঙ্গলই হাতে ছিল, কাদের সঙ্গে তাদের ছেলেরা থাকতেন।

একবার ওমনি জঙ্গলে গিয়ে তিন দিন বাদে ছেলেদের কোথায় রেখে শুধু কর্তা, দুই ভাই ফিরে এলেন। তাদের সে মুখের দিকে তাকানো যায় না, যেন

একটা ঝড় বয়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে। দুজনের দুই-দুই চার ছেলেকে কোথায় রেখে এলেন কেউ জানে না। ফিরে এসেই অত বড় ব্যবসার অর্ধেকই বেচে দিলেন তারা–আর কাউকে সঙ্গে না নিয়েই আবার জঙ্গলে ছুটলেন। তার পরদিনই অবশ্য কর্তাদের সঙ্গে তাদের চার ছেলেও ফিরলেন–কিন্তু ছ মাসের মধ্যে কি ব্যাপার কেউ একটি কথাও জানল না।

ছ মাস বাদে সরকারের কাছে এই সব কেচে এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে ব্যাপারটা জানাজানি হল। যাবার আগে পুলিসের কাছে একটা রিপোর্টও করে গেলেন না তারা এটাই আশ্চর্য। জঙ্গল থেকে ফেরার সময় ওই চার ছেলেসহ দুই কর্তা ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। জঙ্গলের ধারেকাছে ডাকাত আছে এমন খবর কেউ কখনো শোনেনি। সেই ডাকাতের দল নাকি তাদের ধরে বহু দূরে তাদের গোপন আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলেছিল–যাবার সময় মোষের গাড়িতে সকলের চোখ বেঁধে নিয়ে গেছে। তারপর বহু হাজার টাকা ছেলেদের মাথার বিনিময়ে মুক্তিপণ হেঁকে চোখ বেঁধে শুধু বুড়ো কর্তা দুজনকে জঙ্গলের বাইরে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে। টাকা। দেবার জন্য পাঁচটি দিন সময় দেওয়া হয়েছিল তাদের–তার মধ্যে জঙ্গলে টাকা না নিয়ে এলে বা কোনরকম চালাকি খেলতে গেলে চার ছেলেরই মৃতদেহ সোনালীর জলে ভাসবে বলে শাসিয়ে দিয়েছে। টাকা নিয়ে ঠিক দিনে তারা জঙ্গলে গেলেই বাদবাকি ব্যবস্থা তারা করবে।

টানা প্রায় ছমাস কর্তাদের ছেলেরা ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল। তাছাড়া বাপেরাই হয়তো ছেলেদের কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করে থাকবেন। কিন্তু সব ছেড়েছুঁড়ে চলে যাবার আগে তাদের ভয় ভেঙে গেছল। ছেলেরাও মদের নেশায় পোক্ত হয়ে উঠেছিল, সেই মদের ঝোকেই তারা সব ফাস করে দেয়। তারা নাকি খুব ভালো করেই জানে, ওই ডাকাত দলের সর্দারণী একজন মেয়েছেলে। তারা তাকে দেখেনি, কিন্তু টের পেয়েছে।

ঘটনাটা শুনে বেশ অদ্ভুতই লাগল লোকনাথবাবুর। পাহাড়ে জঙ্গলে ডাকাতের উৎপাত হতে পারে, যদিও আগে এ-রকম ঘটনার কথা কখনো শোনা যায়নি। আর আগে থাকতে খবর নিয়ে আঁটঘাট বেঁধে যদি ডাকাতেরা কাজে নেমে থাকে–তাহলে মুক্তিপণ হাঁকাটাও অসম্ভব কথা

www.bengaliebook.com

কিছু নয়। কিন্তু ভয়ের চোটে ঘটনার ছমাস বাদেও এঁরা কাউকে কিছুই বলেননি সেটাই আশ্চর্য। হয়তো বা ডাকাতরা শাসিয়ে রেখেছিল, পরেও কাউকে কিছু বললে আর এ নিয়ে পুলিশের তত্ত্ব-তল্লাসী চললেও তাদের গর্দান যাবে।

লোকালয় ছাড়িয়ে মাইল দুই হাঁটলে সোনালী নদী। বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ পায়ে পায়ে সেই দিকে চললেন লোকনাথবাবু। এই এলাকাটাই একসময় সব থেকে প্রিয় ছিল তার। স্কুল-কলেজের বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত এখানে এলে এদিকটাই সব থেকে বেশি চষে বেড়িয়েছেন তিনি।

শীতের অপরাহ্নের মিঠে রোদ, হাঁটতে ভালো লাগছে। এদিকে পা বাড়ানোর পর আরো ভালো লাগছে। তৃষ্ণার্ত দুই চোখ মেলে সোনালীর দিকে এগিয়ে চলেছেন। নদীর দুদিকে সোনার মতো ঝকঝকে বালুর চর– এই জন্যেই নদীর নাম সোনালী বোধ হয়।

দূর থেকে লোকনাথবাবু হতাশ হলেন একটু। সবকিছুর মতো সোনালীও বুড়িয়ে গেছে মনে হল। নদীর দুদিকে চরের পরিধি দ্বিগুণ বেড়ে গেছে মনে হল। কাছে এসে দেখলেন সোনালী অর্ধেক সরু হয়ে তিরতির করে বইছে এখনো, সেই জলে পায়ের পাতা ডোবে কিনা সন্দেহ।

শীতের সময় আগেও অবশ্য হাঁটুজলের বেশি গভীর ছিল না সোনালী। তবে চওড়া এর তিনগুণ ছিল। আর বর্ষায় তো এই সোনালীরই দুকূল ছাপানো সংহার মূর্তি। সুবল ওদের মুখে শুনেছেন, দূরের কোথায় বাঁধ হবার ফলে এখন নাকি বর্ষায়ও সোনালী আর তেমন ভরে ওঠ না।

এখানে এসে বয়েস ভুলে গেলেন লোকনাথবাবু। সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে দিতে দুই চোখে সেই আগের দিনের তৃষ্ণা উপচে উঠল। তিতিরে জলের ওধারে প্রায় দেড় মাইল পর্যন্ত ধু-ধু বালুর চর। তার ওধারে ঘন জঙ্গলের রেখা। তারও ওধারে। সারি সারি বিচ্ছিন্ন পাহাড়।

...আগে হামেশাই লোকনাথবাবু শুকনো চর পার হয়ে ওই জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতেন। দুপাশের জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে আগে পায়ে-হাঁটা-রাস্তা ছিল।

www.bengaliebook.com

এখন কি হয়েছে জানেন না। জঙ্গলের ধারে ধারে আদিবাসী গরীবদের বসতি ছিল। সেগুলো গাছের আড়ালেই ছিল বলে আগেও এত দূর থেকে দেখা যেত না। কর্তাদের ইজারার জঙ্গল এদিকে নয়–সেটা পশ্চিমে! দেবরায়দের সেই চকমিলানো বাড়ির এক-আধ মাইলের মধ্যেই জঙ্গল শুরু হয়েছে। তাদের জঙ্গলও সেইদিকেই ছিল, তবে বহু দূরে। দেবরায়দের ওই বাড়ির ছাদে উঠে লোকনাথবাবু একমনে দাঁড়িয়ে সেদিকের জঙ্গলও দেখতেন। কিন্তু তার সব থেকে ভালো লাগত এ-দিকটা–এই সোনালীর দিকটা।

জুতোজোড়া হাতে নিয়ে লোকনাথবাবু সাগ্রহে সোনালী পেরিয়ে ওদিকের চরে গিয়ে উঠলেন। তারপর ওই জঙ্গল আর পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে চলতে লাগলেন। তেত্রিশ বছর বাদে আবার সেই ছেলেবেলায় ফিরে এসেছেন যেন তিনি। মনের আনন্দে এগিয়ে চললেন।

চর শেষ হল। এদিকটায় জলের রেখাও নেই আর। লোকনাথবাবু ওপারের ডাঙায় গিয়ে উঠলেন। দূর থেকে বনের লাইন যেমন নিচ্ছিদ্র মনে হয় তা নয়। তেত্রিশ বছর আগে যেমন দেখেছিলেন, এ-দিকটায় তার থেকে অন্তত ঢের উন্নতি হয়েছে। বনের মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা চলে গেছে। গাছ-গাছড়ার আড়ালে বেশ সুন্দর কাঠের বাড়িও দেখা গেল গোটাকতক।

ঘন বন একপাশে রেখে আপনমনেই হাঁটতে লাগলেন। জঙ্গলে হিংস্র জন্তু জানোয়ার আছে, লোকালয়ের দিকটায় তাদের পদার্পণ ঘটার কথা নয়।

একটা জীপ পাশ কাটিয়ে গেল। ড্রাইভারের পাশে একজন বয়স্কা রমণী বসে। পরনে ছাপাশাড়ি, মাথায় ঘোমটা। এক নজর তাকিয়ে বাঙালী মনে হল না। লোকনাথবাবুর। কারণ নাকে বড়সড় একটা সোনার নথ। কিন্তু অবাক কাণ্ড, জীপের। গতি শিথিল হল, আর সেই রমণী তার আসন থেকে ঝুঁকে পিছনের দিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে লাগল।

তিনি খানিকটা এগিয়ে আসতে প্রায়-থামা জীপটা হঠাৎ স্পীড বাড়িয়ে চলে গেল। নথ-পরা রমণীর ফর্সা গোলগাল মুখ, কিন্তু মুখের আদল লক্ষ্য করার

সুযোগ হয়নি লোকনাথবাবুর। ভাবলেন, হয়তো কোনো চেনা লোক ভেবেছিল রমণী, চেনা নয় দেখে চলে গেল।

নিজের মনে আরো অনেকখানি এগিয়ে গেলেন লোকনাথবাবু। পাশের বন ক্রমে গম্ভীর হয়ে উঠছে, অন্যদিকে লোক-বসতির আভাস আর চোখে পড়ছে না। আদিবাসীদের কুঁড়েঘরের বসতি দেখেছেন। এখন আর তাও চোখে পড়ছে না।

এত পথ এভাবে হেঁটে এসে ভালো করেন নি, লোকনাথবাবু ফিরলেন। একটু তাড়াতাড়িই পা চালালেন। যতটা এসেছেন, সোনালীর চরে পৌঁছুতে কম করে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে।

কাছাকাছি এসে গেছেন, আর শতখানেক গজ পথ শেষ হলেই সোনালীর চরের সামনে পৌঁছবেন। চকিত হয়ে পিছন ফিরে তাকালেন। একটা জীপ তীরের মতো এদিকেই ছুটে আসছে- তারই শব্দ। সেই জীপটাই কিনা বুঝলেন না। বাঁধানো হলেও সরু রাস্তা। অত স্পীডে আসতে দেখে লোকনাথবাবু বিরক্ত হয়েই পাশ দেবার জন্য একধারে সরে দাঁড়ালেন।

কিন্তু আশ্চর্য, একটু বাদে জীপটা তার পাশেই ঘ্যাঁচ করে দাঁড়িয়ে গেল। হ্যাঁ, আগের সেই জীপই। কিন্তু এতে ড্রাইভারের পাশে রমণীর বদলে অন্য একটি অল্প বয়সী লোক। আর জীপের পিছনে আরো দুটি ছেলে।

চারজনই জীপ থেকে নেমে এলো। তাদের পরনে পরিষ্কার ট্রাউজার আর গায়ে টেরিকটের হাফ-শার্ট। চারজনেরই মুখের আদল একরকম। দেখলেই মনে হবে চার ভাই। কালোর ওপর বেশ মিষ্টি চেহারা। টানা চোখ। সব থেকে আগে চোখে পড়ে স্বাস্থ্যসম্পদ। ওই দুটো করে বাহু যেন দুনিয়ার অনেক শক্তি কেড়ে নিতে পারে।

চারজনই এগিয়ে এসে হাত কপালে ঠেকিয়ে সবিনয়ে নমস্কার করল তাকে। লোকনাথবাবুও বিমূঢ় মুখে প্রতি-নমস্কার জানালেন। এদের মধ্যে সকলের বড়টির বছর বত্রিশ বয়েস হবে, আর সকলের ছোটর বছর পঁচিশ।

ওই বড়জনই জীপ চালাচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার নাম লোকনাথ মিত্র?

বিমূঢ় মুখে লোকনাথবাবু মাথা নাড়লেন– নামটা তারই বটে।

-আপনাকে একবারটি আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।

লোকনাথবাবু আকাশ থেকে পড়লেন।–কোথায়?

–জীপে গেলে খুব বেশি দূর নয়, আপনি কিছু ভাববেন না, আপনাকে আবার আমরা পৌঁছে দেব।

লোকনাথবাবু ভেবাচাকা খেয়ে গেলেন। আমি তো আপনাদের চিনি না, কোথায় যেতে হবে? কেন যেতে হবে?

–আমাদের মা একবারটি আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

–আপনাদের মা! আপনাদের মা কে?

ছেলেটা হাসল। হাসিটা মিষ্টি। জবাব দিল, মা মা-ই, আসুন!

লোকনাথবাবু ফাঁপরে পড়লেন। বললেন, আমি তো এখানে কাউকেই চিনি না বহুকাল বাদে এদিকে এসেছি, কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে, আমাকে কেউ এখানে ডাকতে পারেন না।

ছেলেটা গম্ভীর হঠাৎ। অন্য সকলেও।

বলল, মায়ের ভুল হয় না।–ঘণ্টাখানেক আগে এই জীপে করে যাবার সময় মা আপনাকে দেখেছেন, তাছাড়া আপনার নাম করেই তো আপনাকে নিয়ে যেতে হুকুম করেছেন?

তাও তো বটে।-নথ-পরা সেই রমণীই এদের মা তাহলে! আপনি ছেড়ে এবারে তুমি করে বললেন লোকনাথবাবু।–তোমাদের মায়ের নাম কি?

এই জেরার মধ্যে পড়ে ছেলেগুলো বিরক্ত যেন। ওই বড় ছেলেই জবাব দিল, মা-কে আমরা মা বলেই জানি, নাম-টাম জানি না।

অবাক ব্যাপার। এত বড় বড় ছেলেরা মায়ের নাম জানে না, এও কি বিশ্বাস্য!

তুমি ছেড়ে আবার আপনি করে বললেন লোকনাথবাবু। ব্যাপার-গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না তার।–আপনাদের বাবার নাম কি?

এবারে বড় ছেলেটা স্পষ্টই বিরক্ত।-দেখুন, কোনো কথা না বলে মা আপনাকে শুধু নিয়ে যেতে বলেছেন- আপনি নির্ভয়ে গাড়িতে এসে উঠুন, আবার আপনাকে আমরা পৌঁছে দিয়ে যাব।

মনের ভাব চেপে জিজ্ঞাসা করলেন, গিয়ে আবার ফিরতে কতক্ষণ লাগবে?

–যেতে-আসতে বড়জোর সোয়া-ঘণ্টা, তারপর মা যতক্ষণ আটকে রাখেন আপনাকে।

তার মানে কম করে দু ঘণ্টা। এখনই পাঁচটা বাজে, শীতের আলোয় টান ধরেছে। মাথা নেড়ে বললেন, আমি এখন যেতে পারছি না, এখানে নতুন মানুষ আমি, আপনার মা-কে বলবেন–

–দেখুন, আপনিই মিছিমিছি দেরি করছেন। মায়ের হুকুমে আমরা আপনাকে নিতে এসেছি। তিনি নিয়ে যেতে বলেছেন, আমরা নিয়ে যাব। আপনি দয়া করে গাড়িতে উঠুন।

বিনীত কথাগুলোর মধ্যে এমনই একটা দৃঢ়তার সুর যে ভিতরে ভিতরে বিষম অস্বস্তিবোধ করলেন লোকনাথবাবু। এই নির্জনে জোর করে জীপে টেনে তুললেই বা কি করতে পারেন তিনি! সকলের মুখের দিকেই তাকালেন একবার। এই অযথা বিলম্ব ওরা কেউ পছন্দ করছে না।

দুর্গা নাম নিয়ে জীপের দিকে এগোলেন। তা ছাড়া তার ক্ষতিই বা কি হতে–পারে? তেত্রিশ বছর বাদে এখানে এসেছেন, ক্ষতি করতে খামোখা কেউ

www.bengaliebook.com

চেষ্টাই বা করবে কেন? নথ-পরা একজন রমণী যে ঝুঁকে দেখছিল তাকে, আর এরা এসে নামটাও তো ঠিকই বলেছে।

ওই বড় ছেলে এবারে নির্বাক অথচ সাদর আপ্যায়নে তাঁকে এনে ড্রাইভারের পাশে বসালো। নিজে চালকের আসনে বসল। পরের তিন ছেলে পিছনে।

জীপ ছুটল।

যে গতিতে ছুটল তাতেই ভয় ধরে গেল লোকনাথবাবুর। মাইলের কাটা পঞ্চাশের দাগ ছুঁয়েছে। এই স্পীডে যেতে-আসতে সোয়া-ঘণ্টা লাগলে কম করে পঁচিশ-তিরিশ মাইল যেতে হবে এখন।

আবার ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন তিনি।

আধ ঘণ্টা বাদে একটা পাহাড়ের কাছাকাছি ফাঁকা জায়গায় সুন্দর একটা কাঠের বাংলোর সামনে জীপ এসে দাঁড়াল। পাশেই কাঠের স্তূপ আর একটা কাঠ-কাটা-কলের শেড চোখে পড়ল। বাংলোর বারান্দার রেলিং-এ দুটি অল্পবয়সের বউ দাঁড়িয়ে, আর দুটো ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে ছোটাছুটি করছে।

এইখানেই জীপ দাঁড়াল যখন, অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন লোকনাথবাবু। যাক, কোনো একটা সংসারের মধ্যেই এসে পড়েছেন তাহলে তিনি!

ছেলেরা তাকে আপ্যায়ন করে বাংলোয় এনে তুলল। সেখানেই বসার সুন্দর চেয়ার-টেবিল পাতা। দুদিকে চমৎকার বাগান। অনেক রকমের ফুল ফুটে আছে। এই গৃহস্বামী-গৃহস্বামিনীদের রুচি আছে।

বড় ছেলে হাঁক দিল, মা কোথায়? উনি এসেছেন–

অল্পবয়সী বউ দুটি ভিতরে ঢুকে গেছে। ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে আর মেয়েটা অবাকবিস্ময়ে আগন্তুককে দেখছে।

ভিতরের দরজার কাছ থেকেই বড় ছেলের হাসি আর কথা শোনা গেল।–আরে না–আমরা কোনরকম জোর-জবরদস্তি করিনি–বাইরের দিকে মুখ বাড়ালো সে–আচ্ছা মশাই, আমরা আপনার সঙ্গে কোনরকম অভদ্র আচরণ করেছি?

ঘুরে তাকিয়ে লোকনাথবাবু মাথা নাড়লেন। ছাপাশাড়ির আভাস পেলেন, কিন্তু মুখ দেখতে পেলেন না। ছেলেটি তাকেই বলছে কথাগুলো।

রমণীটি এগিয়ে এলো। মাথায় ঘোমটা, নাকে বড় নথ, বয়সের দরুন সামান্য মোটার দিক ঘেঁষা, মুখের দিকে ভালো করে তাকান নি কিন্তু অবয়ব দেখেই বোঝা গেল খুব ফর্সা রং।

একেবারে চেয়ারের কাছেই এগিয়ে এলো সে, মাথার ঘোমটা অনেকখানি সরে গেছে তখন। তার একপাশে ওই অল্পবয়সী বউদের একটি। ছেলেরা চারজনই সামনে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু রমণীর মুখে একটিও কথা না শুনে সংকোচ কাটিয়ে মুখ তুলে তাকালেন লোকনাথবাবু। আর তারপরেই মাথাটা ঘুরে গেল কেমন। এই বাংলোটাই যেন প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছেন–স্বপ্ন দেখছেন কি সত্যি, ভেবে পাচ্ছেন না!

তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছে একটি রমণী। সেই হাসি তার সমস্ত মুখে, এমন কি কানের ডগা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। হাসলে গালের এক দিকে বড় একটা টোল পড়ে, তাই পড়েছে। সেই টোলের ভিতর দিয়েও যেন হাসি ঠিকরোচ্ছে। নিঃশ. এরকম হাসি একজনই হাসতে পারত, একজনেরই ওরকম হাসি সমস্ত মুখের রেখায় রেখায় ছড়াতো, কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে যেত, মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠত।

নিজের অগোচরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন লোকনাথবাবু। অস্‌ফুট বিস্ময়ে বলে উঠলেন, হাসিরানী।

নিঃশব্দ হাসিটা যত বাড়ছে ততো যেন রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে মুখ। গালের টোলে ততো বেশি খাঁজ পড়ছে। সেই হাসির একটু ছোঁয়া যেন ছেলেদের মুখেও লেগেছে। তারা অল্প অল্প হাসছে আর দুজনকেই নিরীক্ষণ করছে। বউটিও তাই।

-হাসিরানী তুমি! তুমি এখানে!

চোখের দিকেই চেয়ে আছে, তেমনি হাসছে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল– সে-ই বটে। পদ্মহাতের মতো একখানা হাত তুলে তাকে বসতে বলল।

নিজেও সামনাসামনি চেয়ারের একটাতে বসল। তখনো মুখ লাল। হাসি মিলায়নি। হাসি চুয়ে পড়ছে।

বউটি তার চেয়ারের হাতলের কাছে দাঁড়াল। একটা চেয়ার টেনে বড় ছেলে একেবারে মায়ের গা ঘেঁষে বসল। রমণী তার দিকে ফিরে একটুও শব্দ না করে ঠোঁট নাড়ল। হাসছে তখনো।

বক্তব্য বুঝে নিয়ে ছেলে লোকনাথবাবুকে বলল, মা বলছেন– আপনাকে হঠাৎ এভাবে ধরে নিয়ে খুব কষ্ট দেওয়া হল!

লোকনাথবাবু সম্বিত ফিরে পেলেন যেন এতক্ষণে। বললেন, না, কষ্ট কিছু না। তোমার মা-কে আজ তেত্রিশ বছর বাদে দেখলাম... কোনদিন দেখব ভাবিনি, তাই অবাক হয়েছি।

ছেলে হাসিমুখে বলল, আপনি তো আসতেই চাননি, ভাবলেন ডাকাতের পাল্লায় পড়েছেন! মায়ের দিকে চোখ পড়তেই সে আবার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না মা, সত্যিই একটুও খারাপ ব্যবহার করিনি–তুমি জিজ্ঞাসা করে দেখো না

সমর্থনের আশাতেই যেন হাসিরানী লোকনাথবাবুর দিকে তাকালো। অদ্ভুত লাগছে। লোকনাথবাবুর। এখনো যেন সবকিছু বাস্তব ভাবতে পারছেন না তিনি। হাসিরানীর বয়েস বড়জোর বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ মনে

হচ্ছে। কিন্তু লোকনাথবাবু জানেন, হাসিরানীর বয়েস এখন একান্ন–ঠিক দু বছরের ছোট তার থেকে।

বললেন, না, ওরা খারাপ ব্যবহার করেনি, তোমাকে দেখব কল্পনা করিনি তো, তাই আসতে ইতস্তত করছিলাম।

হাসিরানীর মুখে আবার সেই হাসি। ছেলের দিকে ফিরে একবার ঠোঁট নাড়লেন শুধু। সে তক্ষুনি উঠে লোকনাথবাবুর পায়ে হাত রেখে প্রণাম করল। সঙ্গে সঙ্গে বাকি তিন ছেলেও।

হাসিরানী তাদের দিকে চেয়ে আবার ঠোঁট নাড়তে পরের ছেলে জানান দিল, মা বলছেন আমরা মায়ের এই চার ছেলে।

লোকনাথবাবু বলে উঠলেন, বেঁচে থাকো বাবারা, সুখে থাকো।

হাসিরানী বরাবরই রূপসী, কিন্তু এই হাসিমুখ অদ্‌ভুত কমনীয় দেখালো। আবার তার ইশারা পেয়ে বড় ছেলে হাঁক দিল, আর বউরা সব কোথায়, এদিকে এসো, মা ডাকছেন–

ইত্যবসরে যে বউটি সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সেও প্রণাম সেরে উঠল। সেই বোধহয় বড় বউ। সুশ্রী। আরো তিনটি সুশ্রী বউ ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রণাম করল।

বড় ছেলে হাসছে। মা বলছেন, এই তার চার বউ।

আশ্চর্য, মায়ের ঠোঁট নড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে তার কথা এমন পরিষ্কার বুঝে নেয় কি করে লোকনাথবাবু ভেবে পেলেন না। হাসিমুখে হাসিরানী আদুরের বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটোকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে এলো। বড় ছেলে বলল, প্রণাম করো, দাদু

লোকনাথবাব তাদের ধরে ফেললেন।

বড় ছেলে বলল, এই মায়ের দুই নাতি-নাতনী–এটি আমার ছেলে, এটি ভাইয়ের মেয়ে

সুন্দর ঝলমলে সংসার। কি মনে হতে লোকনাথবাবু হাসিরানীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আর কেউ নেই?

ফর্সা মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল। ম্লান স্নিগ্ধ দুটো চোখ তার মুখের ওপর স্থির হল একটু। তারপর সামান্য মাথা নাড়ল– নেই।

বড় ছেলে বলল, দশ বছর আগে বাবা ব্ল্যাক ফিভারে মারা গেছেন।...এদিকটায় তখন ওই রোগ খুব হত। তারপর হেসেই বলল, মাকে কিন্তু আমরাই কক্ষনো সাদা শাড়ি পরতে দিই না।

লোকনাথবাবু মাথা নেড়ে সায় দিলেন শুধু। প্রতিমার আর যাই হোক থান মানায় না। উন্মুখ হয়ে এবার ওই ছেলেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন তিনি। কথাটা ঠোঁটের ডগায় এসে গেছল, এবারে তোমার বাবার নাম বলো, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না।...দরকারও নেই, সবই বুঝতে পারছেন।

হাসিরানী বউদের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে কি ইশারা করতে তারা চলে গেল। এই ইশারাটা লোকনাথবাবুও বুঝলেন। চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বলা হল।

বাধা দিতে চেষ্টা করলেন, আমি এখন কিছু খাব না–

হাসিমুখে একটু দুলিয়ে দুলিয়ে মাথা নাড়ল হাসিরানী। আঠেরো বছর বয়সেও মাথা নাড়তে হলে ঠিক যেমনটি করত। অর্থাৎ বলতে চাইল, তা হয় না।

...কর্তাদের চকমিলানো দালান থেকে আঠারো বছরের বোবা মেয়ে হাসিনী হারিয়ে গেছল একদিন। হারিয়ে যায়নি, সকলেই ধরে নিয়েছিল প্রকারান্তরে সে। আত্মঘাতিনীই হয়েছিল। নিখোঁজ হবার আগের দিনও বিপদের স্পষ্ট হুশিয়ারী এসেছিল। আর সেটা উপেক্ষা করেই সে মরণ বরণ করেছিল।

www.bengaliebook.com

..আর বিশ বছরের বি-এ পরীক্ষা দেওয়া এক ছেলে ভেবেছিল, দুঃখে অপমানে তার জন্যই মেয়েটা প্রাণ খোয়ালে। তার আত্মহত্যার সামিল কাজ করার জন্য সে-ই দায়ী। তেত্রিশ বছর আগে সেই ছেলেটা অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছল।

সেই ছেলে লোকনাথ মিত্র।

সে-সময়ে বুড়োকর্তার তিন ছেলের মধ্যে বড় ছেলের একমাত্র মেয়ে হাসিরানী। বাঘের থাবায় পচন ধরে- যে ছেলে প্রাণ খুইয়েছিলেন তাঁর।

মেয়েটার হাসি দেখেই বুড়োকর্তা তার নাম হাসিরানী রেখেছিলেন বোধহয়। লোকনাথ, খুড়তুতো ভাই মন্মথ, আর বুড়োকর্তার নাতিরা আর এই নাতনী একসঙ্গে পাশাপাশি বড় হয়েছে। দু বছর বয়সে হাসিরানীর টাইফয়েড না কি মরণাপন্ন ব্যাধি হয়েছিল। তখন ও রোগের চিকিৎসা নেই। বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। কিন্তু বাচল শেষ পর্যন্ত। কথা বলার মধ্যে সেই দু বছর বয়সেই কেমন একটু জড়তা ছিল। মেয়েটার। সেই কথা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কথা বলতে চেষ্টা করলে মুখ দিয়ে কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ বেরুতে শুধু।

ওর পাঁচ বছর বয়সে তার বাবা সেই বাঘের ক্ষত নিয়ে ফিরে এলেন। সঙ্গে ছিল বিশ্বাসী আর দুরন্ত সাহসী চাকর কিষণচাঁদ। চাকর বলা ঠিক হবে না, আসলে সে ছিল বড়বাবু অর্থাৎ বড় ছেলের শিকারের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। কিষণচাঁদ হুবহু বাঘের ডাক ডেকে বাঘকে ভুলিয়ে কাছে নিয়ে আসতে পারত। আরো অনেক রকম ডাক ডেকে জন্তু-জানোয়ারকে ঘাবড়েও দিতে পারত। বড়বাবুর প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে সেই কিষণচাঁদ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছিল। তার একটা মাত্র ছেলে, বছর চৌদ্দ বয়েস, বাপের মতোই ষণ্ডামার্কা হবে বড় হলে বোঝা যেত। তার নাম মগন, সে বাবুদের বাড়ীর ফাই-ফরমাস খাটত। কিষণ মরে যেতে মগনকেও বুড়োকর্তা সস্নেহে কাছে। টেনে নিয়েছিলেন। একই অঘটনে বড়বাবুও চোখ বুঝতে বুড়োকর্তার হুকুমে মগনের কাজ হল তার বোবা মেয়েটার দেখাশুনা করা, তাকে খেলা দেওয়া।

হাসিনীর বয়স তখন পাঁচ, লোকনাথ আর মন্মথের সাত, আর ওই মগনের চৌদ্দ। লোকনাথ বা মন্মথ মগনকে তেমন পছন্দ করত না, কুচকুচে কালো ছোঁড়াটা হাড়পাজী–আর গায়ে জোরও তেমনই, যখন-তখন ধরে রামঝকানি-টাকানি দিত। মেয়েটাকেও এক-একসময় দু হাতে একেবারে মাথার উপর তুলে ফেলত। কিন্তু হাসিরানী একটুও ভয় পেত না, নীরব হাসিতে ওর সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ হয়ে যেত।

পাঁচ বছরে হাসিরানীর বাবা মারা গেছলেন, সাত বছর না হতে তার মা-ও চোখ বুজলেন। স্বামী অঘটনে মারা যাবার পর থেকেই মহিলা জীবন্মৃত হয়ে ছিলেন। সকলেই বলাবলি করতে লাগল মেয়েটা অভাগা, বিশেষ করে হাসিরানীর কাকা কাকীমারা, আর লোকনাথের কাকীমাও।

মগনের তখন ওকে আগলাবার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। সে-ই যেন গার্জেন ওর। কর্তাবাবুদের চোখের আড়ালে মেয়েটার ওপর মগন দস্তুরমতো হম্বিতম্বি করত, একটু-আধটু শাসনও করত। কিন্তু লোকনাথ বা মন্মথ এমন কি হাসিরানীর খুড়তুতো ভাইরাও ওর সঙ্গে লাগতে এলে মগন মারমুখী একেবারে। সে-বেলায় কারোও ক্ষমা নেই।

বুড়োকর্তা সময়ে চোখ বুজলেন। হাসিরানীর বয়স তখন নয়। মগনের আঠেরো। পেল্লায় জোয়ান হয়ে উঠেছে। পাথুরে কালো গায়ের রং-এ যেন জেল্লা ছোটে। ওই ফুটফুটে মেয়েটার হাত ধরে পুকুরের পশ্চিম দিকের ঝোঁপঝাড় বনে-জঙ্গলে যখন ঘুরে বেড়াতো–তখন অদ্‌ভুত দেখতে লাগত। তপ্তকাঞ্চন আর নিকষ কালোর দুই সচল মূর্তি। পশ্চিমের ওই জঙ্গলই বড় জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। মেয়েটাকে ওদিকে নিয়ে যেত বলে গিন্নিদের কাছে বকাঝকা খেত মগন। কিন্তু ও তাদের কথা কানেই তুলত না। ফলে তারাও মগনের ওপর ক্‌রুদ্ধ। হাড়

এই সময়ে মগনের চাকরিটা গেল। বাবুদের চোখ দিয়ে দেখতে গেলে অপরাধ গুরুতরই বটে। প্রথম অপরাধ, নিষেধ সত্ত্বেও, পুকুরের পশ্চিম দিকে নিয়ে গেছে। মেয়েটাকে। তার সঙ্গে মেজকর্তার এক ছেলেও ছিল। কি কারণে রেগে গিয়ে মগন হাসিরানীর এত জোরে হাতটা ধরেছে যে বোবা

মেয়েটা বীভৎস আর্তনাদ করে উঠেছে একটা। গালে রক্তের চাপ ধরে গেছে। মেজকর্তার ছেলে কি বলে উঠতে তার গালেও একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছে।

গিন্নিরা কর্তাদের কাছে নালিশ করেছেন। মেয়েটার গালের দাগ দেখিয়েছেন। ছেলের গায়ে হাত তোলার কথাও বলেছেন শুনে মেজকর্তা পায়ের চটি খুলে মগনকে বেশ করে প্রহার করে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন। এ-বাড়ীর ত্রিসীমানায় আর তাকে দেখা গেলে গায়ের ছাল থাকবে না, তাও বলে দিয়েছেন।

মগনের চাকরি যেতে সকলেই খুশি, এমন কি লোকনাথও কেবল ওই মেয়েটা ছাড়া। মগন ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী।

মগনকে কিন্তু প্রায়ই পশ্চিমের পুকুরঘাটের জঙ্গলের দিকে ঘুরঘুর করতে দেখা যেত। বিশেষ করে দুপুরে, কর্তারা যখন বাড়ি থাকেন না– আর গিন্নিরা যখন দিবানিদ্রায় মগ্ন। হাসিরানীকে চুপি চুপি ওর কাছে যেতে দেখা গেছে। আবার অন্য ভাইদের নালিশের ফলে ধরাও পড়ত হাসিরানী। রেগে গিয়ে কাকীমারা তখন ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতেন। মেয়েটা কিন্তু কাদত না বড়-একটা।

মেয়েটা অপয়া, মেয়েটা বোবা। কাকীমাদের অত্যাচার বাড়তেই থাকল ওর ওপর। আর মেয়েটাও একগুঁয়ে তেমনি। মারুক ধরুক, জঙ্গলের দিকে যাবেই–ফাঁক পেলে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াবেই। কাকীরা ছেড়ে কাকারাও কতদিন মারধর করেছেন ঠিক নেই।

হাসিরানীর চোখে জল গড়ায়, কিন্তু গলা দিয়ে কান্নার শব্দ বেরোয় না। কিন্তু এই মেয়ের হাসি যেন এক অদ্ভুত জিনিস। হাসিটা যেন ছোঁয়াচে রোগের মত ওর। কারণে-অকারণে হাসতে হাসতে রক্তবর্ণ হয়ে যায় একেবারে। তখনো গলা দিয়ে শব্দ বার করে না বিশেষ। হাসলে গালে টোল খায় আর হাসিটা যেন তার মধ্যেও লুটোপুটি খায়।

ওকে হাসাতে বড় ভাল লাগত লোকনাথের। একটু চেষ্টা করলেই হাসাতে পারত। ও মেয়ে সর্বদাই যেন হাসার জন্য তৈরি হয়ে আছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে যখন, তখনো মনে হয় হাসি-হাসি মুখ।

চৌদ্দ ছেড়ে পনেরয় পা দিয়ে এই মেয়েই বাড়ির অশান্তির কারণ হয়ে উঠল। এত রূপ সচরাচর চোখে পড়ে না। তেমনি স্বাস্থ্য। কিন্তু বুদ্ধি যেন হয়ইনি। এখনো সেই হাসি মুখে লেগে আছে–আর পশ্চিমের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো আছে। কাকীমাদের। চোখের বিষ ও এখন। এখনো গুম-গুম কিল বসিয়ে দেন তারা, চুলের ঝুঁটি ধরে মাটিতে শুইয়ে ফেলেন। বাড়ির আঙিনার বাইরে সেদিন ওকে মগনের সঙ্গে ঠোঁট নাড়তে দেখে আর হাসতে দেখে তো কাকীমারা রেগে এমন আগুন যে, কাকারা পর্যন্ত সেই নালিশ শুনে রীতিমতো মেরেছেন ওকে। আর দুদিন দরজায় শিকল তুলে দিয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছিলেন।

সেই সময় মন্মথ প্রায়ই বলত, হাসিরানীকে দেখলেই আমার বুকের ভিতরটা কেমন করে। লোকনাথ ঠিক বুঝতে পারেননি তখনো, কেমন করে ওর বুকের ভেতরটা। মেয়েটাকে দেখলে লোকনাথের আগের থেকে ঢের বেশি ভালো লাগে এই পর্যন্ত কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করে-টরে না।

বছর দুই বাদে বুঝতে পারল, মন্মথর বুকের ভিতরটা কেমন করে। হাসিরানীর তখন সতের, ওদের উনিশ। নীল ডুরে শাড়ি পরে যখন ঘুরে বেড়ায়, চোখ ফেরানো যায় না। মন্মথ ততদিনে আরো সেয়ানা হয়েছে। একদিন চুপি চুপি বলল, হাসিকে দেখলাম পশ্চিমের ঝোঁপ-ঝাড়ের আড়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রায়ই যায় ওদিকে, মেয়েটা তো কথা বলতে পারে না–একদিন ধরব চেপেচুপে!

মন্মথর সঙ্গে লোকনাথের সেদিন দস্তুরমতো রাগারাগিই হয়ে গেছল।

পরের বছর। হাসিরানীর আঠেরো আর ওদের কুড়ি।

মন্মথ ম্যাট্রিকের বেড়া ডিঙোতে না পেরে এখানেই থাকে, তার বাপের সঙ্গে বাবুদের কাজকর্ম দেখে। কিন্তু আসলে কিছুই করে না। লোকনাথ

ততদিনে খুব ভালোভাবে আই-এ পাস করে সেবারে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কমাসের জন্য ঘরে ফিরেছে।

বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কাকা-কাকীমার খুব হাসিমুখ দেখল। এতটা সচরাচর দেখে না।

মন্মথ ফাঁক পেয়েই তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর তাজ্জব কথা শোনালো। তিন মাস আগে হাসিরানীর কাকারা এক বউ-মরা আধবয়সী লোকের সঙ্গে হাসিরানীর বিয়ের ঠিক করেছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল সেই লোকটার মাথা কে দুর্ফাক করে দিয়েছে-প্রাণে বেঁচে সে আর বিয়ের নামও করছে না।

হাসিরানীর কাকারা তখন মন্মথর বাবাকে ধরেছে। লোকনাথের সঙ্গে হাসিরানীর বিয়ে দিতে হবে। তার জন্যে কাকারা অনেক টাকাও খরচ করবেন। ওর বাবা নাকি তাতে রাজি হয়েছেন। লোকনাথ এসেছে, এবারই বিয়েটা হয়ে যাবে।

লোকনাথের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তার তখন ভবিষ্যৎ-চিন্তা অন্যরকম। কমপিটিটিভ পরীক্ষা দেবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তার মধ্যে কিনা বিয়ে! আর যত রূপসীই হোক, একটা বোবা মেয়েকে বিয়ে করবে ও! কক্ষনো না, কক্ষনো না।

এরপর কাকা-কাকীমা ওঁকে খবরটা জানালেন। লোকনাথ মাকে বলল, সে এখন বিয়ে করবে না।

কাকা ততোধিক গম্ভীর। ধমকে বললেন, এটা ফাজলামোর ব্যাপার নয়, কর্তারা নিজের মুখে এ প্রস্তাব দিয়েছেন তার ভাগ্য ভালো। তাদের কথা দেওয়া হয়ে গেছে, এর আর নড়চড় হবে না।

লোকনাথ ঠিক করে ফেলল, বিয়ের আগেই সে পালাবে। জীবনে সে আর এ-মুখো হবে না। কিন্তু মেয়েটাকে দেখে বড় কষ্ট হল তার। রূপ যেন ফেটে

পড়ছে। ওর সঙ্গে দেখা হতেই ফিক করে হাসল, গালে টোল পড়ল সেই হাসি সমস্ত মুখে ছড়ালো। চটপট সরে পড়ল সে।

লোকনাথ বুঝল মেয়েটাও শুনেছে সব। দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু বিয়ে সে এখানে করতে পারবে না– পালাবেই।

পরদিন দুপুরে মেঘলা দিন দেখে পশ্চিমের জঙ্গলের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছিল লোকনাথ। জঙ্গলের পরিবেশ তার ভালো লাগে।

হঠাৎ বিষম চমকে উঠল। সামনে হাসিরানী। ওকে দেখে সেও ভয়ানক চমকে উঠেছে। ঘাটের থেকে বেশি দূরে নয় অবশ্য জায়গাটা। লোকনাথ জিজ্ঞাসা করল, হাসিরানী, তুমি এখানে একলা কি করছ?

হাসিরানীর মুখে লালের ছোপ লাগল। কিন্তু মুখ শুকনো। লোকনাথ ভাবল, পাছে। বাড়িতে বলে দেয়, সেই ভয়।

লোকনাথ বলল, আমি কাউকে কিছু বলব না। শোনো..বাড়ির সব কি কাণ্ড করতে যাচ্ছে শুনেছ?

হাসিরানী মাথা নাড়ল– শুনেছে।

–ইয়ে…তুমি কি বলো?

মুখের দিকে সোজা তাকালো। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি। বিপরীত মাথা নেড়ে আপত্তি জানালো কিছু।

–বিয়ে করতে চাও না?

আবার মাথা নাড়ল– চায় না।

–আমি কি করব? আপত্তি করব?

মাথা নেড়ে সায় দিল।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল লোকনাথের। বলল, আমি ভাবছি এখান থেকে পালিয়ে যাব!

এবারে একগাল হেসেই সায় দিল। অর্থাৎ সেই ভালো।

লোকনাথ চলে এলো। কিন্তু মেয়েটার কথা ভেবে অবাকই লাগছে তার। শেষে। ভাবল, বিয়ে কাকে বলে ও বোধহয় তাই-ই জানে না।

এমন দিনে সমস্ত এলাকায় যেন হঠাৎ নাড়াচাড়া পড়ে গেল একটা। ভয়ে সক্কলের মুখ শুকালো। পশ্চিমের জঙ্গলে সেদিন সন্ধ্যায় বাঘের ডাক শোনা গেল। দূরে অবশ্য, কিন্তু বাঘের কাছে কত আর দূরে? বারোশিঙা হরিণেরও বিদঘুঁটে ডাক শোনা যেতে লাগল! বাঘের পদার্পণ ঘটলে তারা অমনি ডেকে নিজেরা হুঁশিয়ার হয়, আর অন্য জীব-জন্তুকেও হুশিয়ার করে।

পর পর দু-তিন দিন দূরে দূরে বাঘের ডাক শোনা যেতে লাগল। তার পরের দিন দিনের বেলায়ও শোনা গেল। কর্তাদের বন্দুক আছে দুদুটো। কিন্তু সে বন্দুক হাতে নেবার মতো আর মানুষ নেই। পাহারাদার আছে একটা। তার কাঁধে একটা বন্দুক উঠল। কিন্তু ভয়ে তারও মুখ আমসি। কর্তারা শহরে খবর পাঠালেন। কিন্তু সেখান থেকেও কোনো সাড়া আসছে না।

...দূরে পশ্চিমের জঙ্গলে আগে বাঘের উপদ্রব খুবই ছিল। কিন্তু দশ বছরের মধ্যে সে ভয় নির্মূল হয়ে গেছে। কত বাঘ যে মারা পড়েছে ঠিক নেই। অন্য কোনো জঙ্গল থেকে ছিটকে-ছটকে এসে গেছে একটা। অত দূর থেকেও এমন গুরুগম্ভীর ডাক শোনা যায় যখন, বড় বাঘ সন্দেহ নেই। যতো দূরেই হোক, বাবুঘাটের ত্রিসীমানায় লোক মাড়ায় না। ঝোঁপঝাড় গাছপালার পরেই তো ঘন জঙ্গল শুরু। বড়-জোর এক-দেড় মাইল। ঘাটের দিকের কর্তাদের বাড়ির জানলা-দরজা পর্যন্ত অষ্টপ্রহর বন্ধ। ত্রাসে দিশেহারা সকলেই। লাঠিসোটা টিন কানেস্তারা নিয়ে লোকজন সন্ধ্যার পর থেকে সমস্ত রাত কর্তাদের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

সেদিন সকালের দিকেই বাড়ির সকলের রক্ত জল। পুকুরের ওপারে ঝোঁপ-ঝাড়ের কাছাকাছি বাঘের গরগর গলার শব্দ পাওয়া গেছে–আর দিনমানেই বারো-শিঙারা ডাকাডাকি ছোটাছুটি করেছে। লোকনাথরাও কর্তাদের বাড়ির সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে পুকুরের ওপারের দিকে চেয়ে ছিল– আবার দরকারমতো ছোটার জন্যও প্রস্তুত ছিল সকলে।

কিন্তু বাঘের আওয়াজ আর শোনা গেল না। কেউ কেউ মন্তব্য করল, বাঘ ওদিকের ধারেকাছেই খেয়েদেয়ে ঘুম লাগিয়েছে।

...সেই দুপুরেই অঘটন ঘটে গেল। সকলে তখন ঘুমে। বাড়ির একটা ঝিয়ের হঠাৎ চোখ গেল পুকুরের ওপারে ঝোঁপের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে বড় কর্তার মেয়ে হাসিরানী। বাড়ি কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠল ঝিটা। তারপর পড়ি-মরি করে ছুটল তাকে ধরে আনতে। এত থেকে চিৎকার চেঁচামিচি শুনতে পাওয়ার কথা নয়, শোনা গেলও না। হাসিরানী তখন আপনমনে ঝোঁপ-ঝাড়ের আড়ালে অনেকটা। চলে গেছে, আর তাকেও দেখা যাচ্ছে না। ঝিটা একাই তারস্বরে চিৎকার করতে করতে পুকুরের ধার ধরে ছুটল। আর কেউ এগোতে সাহস করছে না–হাসিরানীর কাকীমারা দোতলায় দাঁড়িয়েই কাঁপছেন ঠকঠক করে।

ঝিটা চিৎকার করতে করতে সবে পুকুরের ওপারে পৌঁছেছে-হঠাৎ একেবারে কাছেই বাঘের প্রলয়ংকর গর্জন–চতুর্দিক কাঁপিয়ে দিয়ে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে-রকম গর্জন করে ওঠে তেমনি। গর্জন আর থামে না। ঝোঁপঝাড়ের ওধারেই ওটা যেন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করছে একটা। ঝি-টা আবার আর্তনাদ করতে করতে তীরের মতো এপারে ছুটে এসে মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কর্তাদের বাড়ির সামনে তখন অনেক লোক কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। লোকনাথ আর মন্মথও ছিল।

খানিক বাদে বাঘের গর্জন থেমেছে।

www.bengaliebook.com

সকলে যা বোঝবার বুঝে নিয়েছে। বড়কর্তার রূপসী বোবা মেয়েটাকে বাঘে টেনে নিয়ে গেল। সকলেই বলাবলি করল, মেয়েটা যেন আত্মঘাতিনী হল। ইচ্ছে কবেই বাঘের মুখে গিয়ে পড়ল।

লোকনাথেরও সেটাই স্থিরবিশ্বাস। আত্মাহুতি দিয়ে সে তাকে এবং অন্য সকলকে অব্যাহতি দিয়ে গেল। তারপর আর কোনদিন বাঘের ডাক শোনা যায় নি। দুদিন বাদে জঙ্গল তল্লাস করা হয়েছিল অনেক লোকজন নিয়ে, কিন্তু মূষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে এর মধ্যে বাঘের বা রক্তের কোনো চিহ্নও মেলেনি।

.

সমস্ত মুখ দিয়ে হাসি চুয়ে চুয়ে পড়ছে হাসিরানীর। পাশ থেকে বড় ছেলের সহাস্য উক্তি, কাকা, আমরাও বাবা আর দাদুর মতো ভয়ংকর বাঘের ডাক ডাকতে পারি–আপনাকে শোনাতে বলছেন!

লোকনাথবাবু হাসিরানীর দিকেই চেয়ে আছেন আর হাসছেনও। চা-জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছে–অন্য ছেলেরা আর বউরাও হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।

লোকনাথবাবু বড় ছেলেকে বললেন, তার থেকে তোমার বাবার একখানা ফটো থাকে তো আমার বড় দেখার ইচ্ছে।

মায়ের ইশারায় বড় ছেলে তাকে নিয়ে সামনের ঘরে ঢুকল। সামনের টেবিলেই টাটকা মালা পরানো মস্ত একখানা ফটো। ফটোর মধ্যে দাঁড়িয়ে মগন যেন হাসছে তার দিকে চেয়ে। হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা। পাথরে খোদাই করা দেহ।

ফিরে এসে লোকনাথবাবু বসলেন আবার। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়েছে। কিন্তু লোকনাথবাবুর উঠতে ইচ্ছে করছে না। মায়ের ঠোঁট-নাড়ার দিকে খানিক মনোযোগ দিয়ে চেয়ে থেকে বড় ছেলে তার দিকে ফিরল।-মা আপনাকে যে জন্য ডেকে এনেছেন, এতক্ষণ সেটাই আপনাকে বলা হয়নি। শুনে আপনিও মতামত দেবেন।

এবারে যে কথাগুলো বলে গেল সে, শুনে লোকনাথবাবু স্তব্ধ খানিকক্ষণ।

–চার ছেলেকে মা তার মনের মতো করে মানুষ করেছে, মায়ের হুকুমে তাদের লাঠি চালানো, ছোরা খেলা আর বন্দুক ছোঁড়া শিখতে হয়েছে। শিকারে পটু হতে হয়েছে। মা সর্বদাই বলতেন তার একটা কাজ ছেলেদের করে দিতে হবে–আর সেই কাজের জন্য বড় হয়ে তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এই প্রস্তুত হবার ব্যাপারে বাবাই ওদের সাহায্য করেছেন। মারা যাবার আগেও তিনি বলে গেছেন, মা যা বলে তাই করবি, তাতে জান যায় যাক!

সেই কাজের সময় এসেছিল ছ বছর আগে। মায়ের হুকুমে আচমকা ঘেঁকে। ধরে ঠিক ডাকাতের মতোই মায়ের বাপের বাড়ির কর্তাদের দু ভাইকে আর তাদের চার ছেলেকে আটক করে আনা হয়েছিল। তাদের গায়ে কেউ হাত তোলেনি, কিন্তু ভয়ে তারা তখন আধমরা। তার তিন ভাই বন্দুক হাতে ওই চার ছেলেকে পাহারা। দিয়েছে–আর বড় ভাই আলাদা ঘরে মায়ের দুই কাকাকে। মা শুধু তার কাকাদের ঘরে এসেছেন, প্রণাম করেছেন, তারপর তার মারফৎ কাকাদের জানিয়েছেন-পৈতৃক সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ মায়ের পাওনা–তার বিনিময়ে নগদ মূল্য না পেলে ছেলেদের হাত থেকে ওঁদের ছেলেদের রক্ষা করা যাবে না। মায়ের কাকারা অনেক মিনতি করেছেন ছেড়ে দেওয়ার জন্য, ছেড়ে দিলে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করবেন।

মা অবিচল কঠিন। তার হুকুম, কাকার ছেলেরা তার জিম্মায় থাকবে, কাকারা টাকা আনার জন্য যেতে পারেন–পাঁচ দিন সময়, তার মধ্যে তাদের ছেলেদের কেউ কেশ স্পর্শ করবে না–কিন্তু পাঁচদিনের মধ্যে টাকা না নিয়ে এলে আর তাদের রক্ষা করার কোনো দায়িত্ব তার থাকবে না।

…কাকারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। মাকে, মা রাজি হননি। শেষে সত্তর হাজার টাকায় রফা হয়েছে।

পাঁচদিনের মধ্যে সেই টাকা তারা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে ছেলেদের মুক্ত করে নিয়ে গেছেন।

হাসিরানী চেয়ে আছে লোকনাথবাবুর দিকে। একাগ্রভাবে যেন সে জানতে চায় কিছু। লালচে মুখ গম্ভীর এখন।

বড় ছেলে বলল, এখন মায়ের জিজ্ঞাস্য, এ-ভাবে দাবি আদায় করে মা পাপ করেছেন কিনা, অন্যায় করেছেন কিনা।

লোকনাথবাবু মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে ছিলেন তার দিকে। এরকম রমণী তিনি এ জীবনে আর দেখেন নি। বললেন, কোনো পাপ করোনি, কোনো অন্যায় করোনি তুমি যা করেছ তোমার ছেলেরা তা সোনার অক্ষরে লিখে রাখে যেন, বংশ বংশ ধরে সকলে যেন জানতে পারে।

আবার ওই মুখে হাসি ভরাট হতে লাগল, গালে টোল পড়ল, ঠোঁট দিয়ে গাল দিয়ে নাক-চোখ-কান দিয়ে হাসি ছুঁয়ে ছুঁয়ে পড়তে লাগল যেন।

আত্মবিস্মৃতের মতো চেয়েই আছেন লোকনাথবাবু। তার মনে হতে লাগল, তেত্রিশ বছর আগে বাবুদীঘির নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে বাঘের ডাক শুনেছে সকলে কদিন ধরে। বাঘিনীর নিঃশব্দ গর্জন কেউ শোনেনি।

মধুরঙ্গ

মধু রঙ্গনাথনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ছাব্বিশ-সাতাস বছর আগে। তার বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ, আমারও তাই। ট্রেনে কলকাতা থেকে বম্বে যাচ্ছিলাম। আমার একটা গল্প ছবি করার ব্যাপারে সেখানে গরম তোড়জোড় চলছিল। বাংলা গল্পের হিন্দি ছবি হবে। হামেশাই হয়। কিন্তু সেই উঠতি বয়সে অমন ভাগ্য দুর্লভ মনে হয়েছিল। তাই মনে আনন্দ ছিল। ভিতরে বেশ একটু উত্তেজনাও ছিল। গল্পের কাঠামো একটু-আধটু অদল-বদল করার ব্যাপারে খোদ পরিচালকের টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটেছি। পরের পয়সায় ফার্স্ট ক্লাসে তোফা আরামে যাচ্ছিলাম।

সেই সময় সামনের বার্থের একটি সমবয়সী অবাঙালী ছেলে আমার চোখ টেনেছিল। ছিপছিপে বেঁটে-খাট গড়ন, গায়ের রঙ কালোই বলা যায়। সে-ও আমার মতোই নিঃসঙ্গ যাত্রী, কিন্তু যতবার চোখাচোখি হয়েছে, দেখি অস্বাভাবিক গম্ভীর। অথচ ওই মুখের আদল কেমন যেন চেনা-চেনা ঠেকছিল আমার। ১৪৮

আলাপের চেষ্টায় এগিয়েছিলাম, কিন্তু লোকটা ভয়ানক নির্লিপ্ত আর নিরুত্তাপ। সে-ও বম্বে যাচ্ছে শুনে আমি একটু উৎসাহ বোধ করেছিলাম, কিন্তু তার ঠাণ্ডা হাবভাব দেখে সেটা বেশিক্ষণ থাকল না। ভাবলাম আমি পরের পয়সায় কায়দা করে ফার্স্ট ক্লাসে চলেছি, এ হয়তো পয়সাঅলা কোন বড়লোকের ছেলে হবে, সেই দেমাকে এত গম্ভীর। অতএব আমিও বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত নিস্পৃহ থাকতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু যতবার তার দিকে চোখ গেছে ততবার মনে হয়েছে এই মুখ আমি কোথাও দেখেছি।

একবার ও নিজের ছোট সুটকেসটা টেনে এনে খোলার মুখে ডালার ওপর লেবেল আঁটা নাম চোখে পড়ল–মধুরঙ্গ। এই নাম দেখে কোন দেশের বা কোন জাতের মানুষ ঠাওর করা গেল না। কিন্তু সুটকেস থেকে যে বস্তুটা বার করল, দেখে আমার চক্ষুস্থির। লম্বাটে ধরনের এক বাণ্ডিল বিড়ি। কোন ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জারের মুখে বিড়ি দেখব এটা তখন কল্পনার বাইরে। একটা বিড়ি নিজের ঠোঁটে ঝোলাল। আমাকে চেয়ে থাকতে দেখে ড্যাবড্যাব করে সেও খানিক চেয়ে রইল। তারপর ইংরেজিতে মন্তব্য করল–ফাইন স্টাফ, চলবে?

আমি হকচকিয়ে গিয়ে হাত বাড়ালাম। অতি সাধারণ একটা লাইটার জ্বালিয়ে সে আমার বিড়ি ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা ধরাল। তারপর মস্ত একটা তৃপ্তির টান।

আমাদের কাণ্ড দেখে কামরার অপর দুই প্রায়-বৃদ্ধ দম্পতি অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

সাধারণ বিড়ি, আকারে একটু বড়, এমন কিছু ফাইন স্টাফ বলে আমার মনে হল না। কিন্তু ঐ লোকটা খুব মৌজ করে টানছে। আধাআধি শেষ করে

আমার দিকে ফিরল আবার। তেমনি নির্লিপ্ত মন্তব্য করল, খুব সস্তা বলে এ জিনিসটা আরো ভালো। লাগে, একগাদা কিনে নিয়েছি।

ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীর মুখে এ-কথা শুনে একটু যেন ধাক্কাই খেলাম। বলে ফেললাম, শুধু সস্তা বলে বিড়ি খান, না কড়া জিনিসের লোভে?

জবাব দিল, চুরুট আরো কড়া, আরো বেশি ভালও লাগে, কিন্তু বেশি দাম–

হেসেই জিজ্ঞাসা করলাম, এত দূরের পথ ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছেন অথচ বেশি দামের জন্য চুরুট কিনে খান না?

বিড়িতে শেষ টান দিয়ে সাদাসাপটা জবাব দিল, আমিও আপনার মতই ফোকটে ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছি–নিজের পয়সায় থার্ড ক্লাসে যেতে হলে চোখে সর্ষেফুল দেখতে হয়!

আমি হতভম্ব। ও ফোকটে মানে পরের পয়সায় যাচ্ছে সেটা নিজে বলল, কিন্তু আমি কার ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছি সে তো আমার গায়ে লেখা নেই–জানল কি করে!

আমার বিস্ময় ওর নিস্পৃহ বিশ্লেষণের বস্তু যেন। নিজে থেকেই বলল, আপনি তো অমুক প্রযোজকের অমকু ছবির স্ক্রীপট-এর কাজে সাহায্য করতে যাচ্ছেন?

বিমূঢ় মুখে মাথা নাড়লাম।

কড়ে আঙ্গুলের ডগটা নিজের কানের গহ্বরে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘন-ঘন নাড়ল একপ্রস্থ। আয়েসে চোখ দুটো ছোট হয়ে এলো। তারপর রয়েসয়ে বলল, আমি বাংলা কথা-বার্তা মোটামুটি বুঝি, আপনাকে যারা তুলে দিতে এসেছিল তাদের আর আপনার কথা থেকেই জেনেছি কেন বম্বে যাচ্ছেন–আপনার ওই ছবিতে আমিও একটা রোল পাবার চেষ্টা করেছিলাম–হল না।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ফিলম আর্টিস্ট?

মাথা নাড়ল।-আর্টিস্ট ঠিক না, ফিলম-ভাঁড় বলতে পারেন।

সুটকেসের লেবেলে নাম দেখেছি মধুরঙ্গ। এই নামের কোন কমিক অ্যাকটর স্মরণে আসছে না। অথচ মুখখানা চেনা-চেনা লাগছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি শেষ কোন ছবিতে কাজ করেছেন?

বলল– আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আমার। হ্যাঁ, হাঁড়ি-মুখো এক কিশোর জবর হাসিয়েছিল বটে এই ছবিটাতে। আর্টিস্ট-এর নামটাও মনে পড়ে গেল তখুনি।

শুধোলাম, আপনার নাম কি?

–মধু রঙ্গনাথন। ছেঁটে সেটাকে মধুরঙ্গ করেছি। ফিল্মের নাম ভিন্ন।

সেই ভিন্ন নাম আজ সুপরিচিত। আর সেই কারণেই নামটা অনুক্ত থাক।

ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে সেই দুদিনের যাত্রাপথে মধু রঙ্গনাথন আমার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সেই বন্ধুত্ব দিনে দিনে বেড়েছে। বম্বেতে সেই প্রথমবারে পৌঁছেও বড়লোকের আতিথ্য ছেড়ে ওর একখানা ঘরেরই ভাগীদার হয়েছিলাম। আর আমার সক্রিয় চেষ্টার ফলে পরিচিত ডিরেক্টার ভদ্রলোক প্রযোজককে বলে ওর একটা রোলের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।

ট্রেনের দুদিনের সান্নিধ্যেই আমার মনে হয়েছিল, মধু রঙ্গনাথন একদিন বড় আর্টিস্ট হবে। কারণ দুদিনের মধ্যে দুবারও ওকে আমি হাসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অথচ ওর কথা শুনে আমি এক-একবার অট্টহাস্য করে উঠেছি। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ওর গাম্ভীর্যটা এতটুকু কৃত্রিম মনে হয়নি কখনো। যেন সত্যি ভাবলেশশূন্য পটের মূর্তি একখানা।

ওকে জিজ্ঞাসা করেছি, ছবিতে না হয় না-ই হাসলে, বাইরেও অত গাম্ভীর্য কেন?

www.bengaliebook.com

মধু জবাব দিয়েছে। কোনটা হাসির ব্যাপার আর কোনটা নয় সেটা যাচাই করার ফাঁকেই হাসির সময়টা উৎরে যায়। তাছাড়া এক-এক সময় হাসি, যখন কেউ হাসে না তখন জোরে হেসে উঠি।

-কেন?

–তাতে অন্য লোকের আমাকে বোকা ভাবতে সুবিধে হয়। তারা হাসে।

ট্রেনের সেই দীর্ঘ দুদিনের অবকাশে অনেক মনের কথা আর মজার করা বলেছে। মধু রঙ্গনাথন। যত শুনেছি তত আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি।

...বিয়ে করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে ও বলেছিল, এবারে কলকাতায় আসার আগেও বাবা তার একজন গেলাসের বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। বাবা তার সঙ্গে থাকে না, অন্যত্র থাকে, আর সূয্যি ডুবলেই মদ নিয়ে বসে। নেশার ঘোরে সেদিন ওর ঘরে এসে গর্জন করে বলল, তোর বউ দরকার, একটা বউ এনে দিচ্ছি।

ছেলে সায় দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, তা তো দরকার...কিন্তু কার বউ আনবে? শুনে ওর বাবাও নাকি চিন্তায় পড়ে গেছে, বলেছে, তাই তো, কার বউয়ের দিকে আবার হাত বাড়াতে যাব!

...কলেজে পড়তে সমবয়সী একটা মেয়েকে বিয়ে করার জন্য নাকি পাগল হয়ে উঠেছিল মধু। শেষ পর্যন্ত সেই মেয়ের ওপর চড়াও হয়ে একদিন আবেদন জানাল, কি বললে তুমি বিশ্বাস করবে আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে বিয়ে করতে চাই?

মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে সেই মেয়ে নাকি জবাব দিয়েছে, মোটে তিনটে কথা বললে!

–কি কথা? কি তিনটে কথা? মধু আশান্বিত।

–এক লক্ষ টাকা।

মধু লম্বা লাফ মেরে পালিয়েছে।

...হয়তো বানানো গল্প সব। শুনে আমি হেসে অস্থির। কিন্তু ওর মুখে হাসি দেখিনি।

বর্তমানের মনের কথাও বলেছে। একটা মেয়েকে ভয়ানক ভালবাসে। ওখানকারই মেয়ে। তার বাপ য়ুনিভার্সিটির প্রোফেসার মেয়ের নাম দুর্গা। সে-ও য়ুনিভার্সিটিতে পড়ছে। ভালো ছাত্রী। কিন্তু মধুর থেকেও গম্ভীর নাকি। বিয়ের কথা একবার বলতে এমন তাকিয়েছিল যে মধুর জমে যাওয়ার দাখিল। অনেক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া ওদের, সেই সুবাদে ছেলেবেলা থেকে জানাশুনা। মধুর সাফ সিদ্ধান্ত, দুর্গাকে হয়। বিয়ে করবে নয়তো খুন করবে। ওর মতে দুর্গা ভয়ানক অবুঝ মেয়ে, ওর জন্যই বেশি টাকা রোজগারের আশায় মধু ফিল্মে নেমেছে, মেয়ে কোথায় খুশি হবে তা না, উল্টে রাগে ফুটছে!

এ-গল্পও খুব যে বিশ্বাস করেছিলাম এমন নয়। কিন্তু বেড়াতে বেড়াতে একদিন ও আমাকে দুর্গার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির। তখনো ওর মতলব বুঝিনি। দুর্গাকে ডেকে বাংলা দেশের মস্ত লেখক বলে পরিচয় দিল আমার। আমার পরিচয় বড় করে তুলে নিজের কদর বাড়াতে চায় বোধহয়। কিন্তু বাংলা দেশের মস্ত লেখকের প্রতি দুর্গার তেমন আগ্রহ আছে মনে হল না। তবে মার্জিত রুচির মেয়ে, অভদ্রতাও করল না। সুন্দরী কিছু নয়, বেশ স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী মেয়ে।

পরের চার-পাঁচ বছরের মধ্যে আরো বারতিনেক বম্বেতে এসেছি। মধুও আর একবার কলকাতায় আমার অতিথি হয়ে এসেছিল। কমিক অ্যাক্টর হিসেবে তখন মোটামুটি নাম হয়েছে ওর! আর আমার সঙ্গে বন্ধুত্বও গাঢ় হয়েছে। কিন্তু মধু রঙ্গনাথনের হাবভাব কথাবার্তা সেই একরকমই আছে। দুর্গার জন্য ওর হা-হুঁতাশ বেড়েছে। দুর্গা এখন কলেজের মাস্টার, ওর দিকে ভালো করে ফিরেও তাকাতে চায়

ফেরাবার চেষ্টা করলেও রেগে আগুন হয়। মধু রঙ্গনাথনের সুখশান্তি সব গেল। দুর্গাকে খুন করার সময় এগিয়ে আসছে কিনা এখন সেই চিন্তা করছে।

এর দুমাসের মধ্যে বম্বে থেকে মধুর উচ্ছ্বাসভরা চিঠি পেলাম, দুর্গাকে খুন করতে পেরেছে, অর্থাৎ বিয়ে করে ঘরে আনতে পেরেছে। সেই প্রহসন শুনলে বন্ধু (অর্থাৎ আমি) নিশ্চয় চমৎকৃত হবে। কিন্তু বিয়ে করার পর দুর্গারই উল্টে খুনী মেজাজ এখন। সকাল বিকেল দুপুর রাত্তিরে মুখ দিয়ে নয়তো চোখ দিয়ে ঝটাপেটা করে ছাড়ছে। কেবল মধুর একটু-আধটু শরীর-টরীর খারাপ হলে ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বড় ডাক্তার ডাকে, অতএব মধু প্রাণপণে শরীর খারাপ করতেই চেষ্টা করছে।

এরপর বম্বেতে এসে ওদের অতিথি হয়েছি। সত্যিই ভালো লেগেছে। মধু রঙ্গনাথন সেইরকমই গম্ভীর প্রায়; কিন্তু ভিতরে ভিতরে ও যে আনন্দে ভাসছে তাও বোঝা যায়।

কি করে শেষ পর্যন্ত দুর্গাকে ঘরে আনা গেল, মধু একদিন চুপি চুপি তাও বলল আমাকে। শুনে আমি হাঁ। বিশ্বাস করব কি করব না ভেবে পেলাম না।

– বললাম, সত্যি বলছ কি বানিয়ে বলছ, দুর্গাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করব।

মধু আঁতকে উঠল।আমার পেশার দিব্বি কেটে বলছি, এক বর্ণও মিথ্যে বলিনি। –কিন্তু দুর্গাকে জিজ্ঞেস করতে গেলে ও ঠিক ডিভোর্স করবে আমাকে!

বিশ্বাস করেছি। কিন্তু যতবার মনে পড়েছে প্রহসনটা, নিজের মনেই হেসে বাঁচি না। মধুর মাথা বটে একখানা–এমন কাণ্ড করেও কাউকে বিয়ে করে ঘরে টেনে আনা যায়!

...দুর্গাকে বিয়ে করতে পারার এই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা আর একটু বাদে ব্যক্ত করব। কারণ ওই একই ব্যাপার থেকে মধু রঙ্গনাথন-এর জীবনের দুটো দিক দেখা গেছে। ...একটা জীবনের দিক, অন্যটা জীবন-মৃত্যুর দিক।

বম্বে গেলে ওদের অতিথি হতাম। দুর্গা আমাকে আদরযত্ন করত। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ওরাও যুগলে এসে কলকাতায় অনেকবার আমার বাড়িতে থেকে গেছে। সেই শুরু থেকে দেখে এসেছি, মধু রঙ্গনাথনকে দুর্গা কড়া শাসনে রাখে।

বেশি বাঁচালতা করলে অন্য লোকের সামনেই ধমকে ওঠে। দুর্গা কলেজের মাস্টারি ছাড়েনি, স্বামীটির ওপর সর্বদাই ওর মাস্টারি মেজাজ। আমার কেমন ধারণা, দুর্গার ওই কড়া শাসন মধুর ভালো লাগে, আর সেই কারণে ওর গম্ভীর বাঁচালতা বাড়ছে। বই কমেনি।

কমিক অ্যাক্টর হিসেবে তার দস্তুরমতো নামডাক তখন। কিন্তু তার ছবির ভাঁড়ামোও দুর্গার চক্ষুশূল যেন। ও ব্যাপারের মাত্রা ছাড়ালে সে দস্তুরমতো রাগারাগি করে! একবারের ঘটনায় বম্বেতেই উপস্থিত ছিলাম আমি। মধুর একটা ছবি তখন। হৈ-চৈ করে চলছে। আমিও দেখে এলাম। ওর রোল আর অভিনয় দেখে পেটে খিল ধরার দাখিল। এক বড়লোকের বাড়ির ড্রাইভারের ভূমিকা ওর। নির্লিপ্ত বোকা-মুখ করে বড়লোকের বাড়ির কেচ্ছা দেখে অভ্যস্ত। ঘরে তার বিষম রাগী আর ঝগড়াটে স্ত্রী এবং একটি বয়স্থা মেয়ে। মেয়ে রূপসী নয় আদৌ। অতএব মেয়ের মা পছন্দ মতো পত্র পায় না। মাথা খাঁটিয়ে মেয়ের মা একটা রাস্তা বার করল। মেয়েকে বলল, বক্স নম্বর দিয়ে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দে–তাতে লেখা থাকবে বড়লোকের ছাব্বিশ বছরের একটিমাত্র মেয়ের জন্য শিক্ষিত সুশ্রী এবং দিলদরিয়া মেজাজের পুরুষ সঙ্গী চাই। মেয়ের বিবাহ কাম্য নয়, অন্তরঙ্গ মেলামেশাটুকুই কাম্য।

মেয়ের মায়ের আশা, এই টোপে বড়লোকের যোগ্য ছেলেরা ছুটে আসবে, আর অন্তরঙ্গ মেলামেশার পরেও মেয়ে মায়ের সাহায্যে একজনকে গেঁথে তুলতে পারবেই।

বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। কিছুদিন বাদে মা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার, বক্স নম্বরের বিজ্ঞাপনের জবাব আসছে না?

মেয়ে আমতা-আমতা করে জবাব দিল, একটা মাত্র এসেছে।

–কার কাছ থেকে? মা উদগ্রীব।

–সেটা একটু গোপনীয়, বলব না।

–হতচ্ছাড়ী মেয়ে, শীগগীর বল–কার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিস?

কাতর মুখ করে মেয়ে জবাব দিল, বাবার কাছ থেকে।

এরপর ওই দজ্জাল মায়ের হাতে বাবার হেনস্থা দেখে হাসতে হাসতে দম বন্ধ হবার উপক্রম।

এই ছবি দেখে দুর্গা নাকি মধুর সঙ্গে কুরুক্ষেত্র করে ছেড়েছে। দুর্গা নিজেই আমাকে বলেছে, ছবিতে নিজের ওই প্রহসন মধু নাকি নিজেই বানিয়ে নিয়েছে। –আসল গলায় ওর কোনো ভূমিকা ছিল না।

কিন্তু যতই কড়া মেজাজ হোক, স্বামীর প্রতি দুর্গার প্রচ্ছন্ন যত্নটুকুও আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ও কম খেলে বা শরীর একটু খারাপ হলে বকা-ঝকার ভিতর দিয়েও ওর আসল দরদের মূর্তিটা আমার চোখ এড়ায় নি।

…গত বছর অর্থাৎওদের বিয়ের প্রায় বিশ বছর বাদে হঠাৎ একদিন খবর পেলাম মধু দুর্গাকে খুইয়েছে। মাত্র তিনদিনের জ্বরে দুর্গা মারা গেছে।

শুনে মনটা কি যে খারাপ হয়েছিল নিজেই জানি। মধুকে দুতিনখানা চিঠি লিখেও জবাব পাইনি। মাস ছয় বাদে বম্বেতে খাবার আমার সুযোগ মিলল। এসেই ওর বাড়ি ছুটলাম। কিন্তু বাড়ি তালাবন্ধ, মধু নেই। কোথায় গেছে তাও কেউ বলতে পারল না। আজ চারমাস ধরে সে নাকি নি-পাত্তা। একসঙ্গে চার-পাঁচটি প্রযোজক ছবির মাঝখানে ওর জন্যে আটকে গিয়ে নাকি মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।

আমার পরিচিত পরিচালক এবং আরো জনাকয়েকের মুখে ওর কথা শুনলাম। সকলেই বীতশ্রদ্ধ মধুর ওপর। কথায় কথায় পরিচালক বলল, ভাঁড়ের ভাড়ামীরও একটা সীমা আছে। বউ মরে যেতে সক্কলের সামনে শ্মশানে দাঁড়িয়ে পর্যন্ত মধু কি। করল জানেন? দুর্গাকে চিতায় শোয়ানো হয়েছে, আর মধু দুই চোখের জল ছেড়ে দিয়ে নিজের একটা হাতের উল্টোদিক মুখে ঠেকিয়ে চটচট শব্দ করে চুমু খেতে লাগল–যেন দুর্গাকেই ক্রমাগত চুমু খেয়ে চলেছে-তার চোখমুখের সে কি হাব-ভাব তখন। যারা ছিল তারা শোক করবে কি, হেসে সারা।

...হাতের উল্টোপিঠ মুখে ঠেকিয়ে শব্দ করে চুমু খাওয়ার একটা রহস্য আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই সকলে একটা ভঁড়ামী ভেবেছে।

...দুর্গাকে বিয়ে করতে পারার সেই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা এবারে ব্যক্ত করা যেতে পারে।

...মধুকে দুর্গা আমল দেবেই না। আর মধুও না-ছোড়। সেদিনের ঘটনা, সেই সকালেও নাকি দুর্গা দাবড়ানী দিয়ে মধুকে বাতিল করতে চেয়েছে, বলেছে, পুরুষকার থাকলে কোনো ছেলে ছবিতে ভাড়ামী করে না–সে একটি দুর্বল-চিত্ত অমানুষকে আবার বিয়ে!

সেই দুপুরেই একজন বান্ধবীর সঙ্গে দুর্গার দেড়শ-দুশ মাইল দূরে কোথায় যাবার কথা। মধুর হাতে কোনো কাজ নেই শুনে দুর্গার বাবা মধুকেই ওদের চলনদার ঠিক করে দিয়েছে। দুর্গার আপত্তি ছিল, কিন্তু এ-ব্যাপারে সোরগোল করে আপত্তি করতেও ওর রুচিতে বাধে। কিন্তু মধু সঙ্গে যাচ্ছে শুনে দুর্গার বান্ধবী মহাখুশি। সে আবার মধুর খুব ভক্ত।

ট্রেনের একটা খুপরিতে ওরা দুজন পাশাপাশি বসেছে, ওদের উল্টোদিকে মধু রঙ্গনাথন। দুর্গার বান্ধবী সেই থেকে ভারী খুশিমেজাজে মধুর সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করছে–আর অনর্গল তার প্রশংসা করে চলেছে। দুর্গা বেশির ভাগ সময়ই গম্ভার।

একসময় একটা মস্ত টানেলের মধ্যে গাড়িটা ঢুকে পড়ল। মধু জানে লম্বা টানেল। গাড়ীর ভিতরে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে নিজের হাতের উল্টো পিঠ মুখে ঠেকিয়ে বেশ রসিয়ে এবং অল্প অল্প শব্দ করে দীর্ঘ একটা চুমু খেয়ে বসল।

গাড়ি অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে বেরুবার আগেই তার আবার হাবাগোবা মুখ।

গাড়ি আবার আলোয় আসার সঙ্গে সঙ্গে দুই মহিলা দুজনের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালো। দুজনারই খরখরে মুখ, করকরে চাউনি। সারাক্ষণ আর কেউ কারো সঙ্গে কথা বলল না।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছে মধুকে আড়ালে টেনে এনে দুর্গা মুখে যা আসে তাই বলে গালাগালি করল- শয়তান বলল, চরিত্রহীন বলল, তাড়িয়ে দিতে চাইল।

মধু জবাবদিহি করল, আমাকে দুর্বল পুরুষকারশূন্য বলো, তাই ভাবলাম

দুর্গা আরো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। আরো বেশি গর্জন করে ওকে তাড়িয়ে দিতে চাইল।

ফলে মধুরও একটু রাগ হয়ে গেল। বলে ফেলল, এতই যদি খারাপ লাগল তো ধরলাম যখন, আমাকে ঠেলে ফেলে দিলে না কেন–অতক্ষণ ধরে চুমু খাওয়া সত্ত্বেও একটু বাধা দিলে না কেন, তোমার ভালো লাগছে ভেবেই আমার আনন্দ হল, আর তাইতেই একটু শব্দ বেরিয়ে গেল। আসলে বান্ধবী পাশে ছিল বলেই তোমার অত রাগ এখন, তখন তো দিব্বি গলা জড়িয়ে ধরলে–

–কি? কি বলছ তুমি? রাগে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল দুর্গা। তুমি আমাকে ধরেছিলে, আর আমি বাধা দিলাম না! আমি তোমাকে ঠেলে ফেলে দিলাম না, আমি। তোমার গলা জড়িয়ে ধরলাম! পাজী শয়তান মিথ্যেবাদী কোথাকার! ১৫৪

www.bengaliebook.com

–যাঃ কলা! মধুর বিমূঢ় মূর্তি।–অন্ধকারে আমি তাহলে নার্ভাস হয়ে গিয়ে কাকে ধরতে কাকে ধরেছিলাম? ছি ছি ছি ছি-আমাকে সত্যি তুমি গুলী করে মারো, তুমি না মারলে আমি ফিরে গিয়ে নিজেই আত্মহত্যা করব।

সঙ্গে সঙ্গে গালের ওপর ঠাস করে একটা চড়। চড় মেরে দুর্গা জ্বলতে জ্বলতে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

...বাড়ি ফিরে বিয়েতে রাজী হয়েছে। কিন্তু দুর্গা কোনদিন বিশ্বাস করেনি, মধু সত্যিই ভুল করে ওই কাণ্ড করেছে। তার বদ্ধ বিশ্বাস, তাকে জব্দ করা আর আক্কেল দেবার জন্যেই বেপরোয়ার মতো বান্ধবীর ওপর ওই হামলা করেছে। বিয়ের পরেও নাকি এই নিয়ে ওকে অনেক গঞ্জনা দিয়েছে দুর্গা।

.

ওদের মুখে শোনা শেষের দৃশ্যটা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। দুর্গা চিতাশয্যায় শয়ান। আর চোখের জলে ভেসে মধু পাগলের মতো নিজের হাতের উল্টোপিঠ মুখে ঠেকিয়ে সশব্দে চুমু খেয়ে চলেছে!

...এই বেপরোয়া কাণ্ড করে মধু রঙ্গনাথন দুর্গাকে একদিন নিজের জীবনে টেনে আনতে পেরেছিল। আর ঠিক এমনি করেই নিজেকে জাহান্নামে পাঠাবার ভয় দেখিয়ে দুর্গাকে সে চিতা-শয্যা থেকে তুলে আনতে চেষ্টা করেছে।

রূপ

বড় দুটোকে নিয়ে গোড়া থেকেই বাপ-মা যেমন নিশ্চিন্ত, ছোটটাকে নিয়ে তেমনি তাদের ভাবনা। তাদের স্বস্তি আর ভাবনার খবর তিন মেয়েও রাখে। তিন মেয়ের মধ্যে বয়সের ফারাক দেড়-দুবছর করে। বড় মেয়ে রমলা সুন্দরী, মেজ মেয়ে শ্যামলী রূপসী, ছোট মেয়ে কাজল ওদের থেকে বেখাপ্পা রকমের বিপরীত। ছোট মেয়ে কালো, ঢ্যাঙা-নাক মুখ চোখের শ্রীও তেমন নয়, চাল-চলনেও তেমনি কমনীয়তার অভাব। রমলা আর শ্যামলীর

বিশ্বাস, ভগবান ওকে হেলে করে পাঠাতে গিয়ে ভুল করে মেয়ে করে পাঠিয়ে বসেছে।

মাকে ছোটর উদ্দেশ্যে কত সময় দুঃখ করতে শুনেছে, এই মেয়েটা যে কোত্থেকে এলো! আর তার ভাবনাতেই বাপের অনেক তপ্ত নিশ্বাস পড়তে দেখেছে। নতুন। পরিচিতেরা এই তিন মেয়েকে একসঙ্গে দেখে আর সম্পর্কের কথা শুনে সংশয়। কাটানোর জন্য মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাই করে বসেছে-ও নিজের বোন তোমাদের?

এ-রকম প্রশ্ন শুনলে বড় দুই বোন লজ্জা পায় আর যার সম্পর্কে কথা সে আড়ালে গিয়ে কুৎসিত ভেঙচি কাটে।

ফলে ছেলেবেলা থেকেই ছোট মেয়ে কাজল বড় দুই বোনের ওপর হাড়ে চটা। পিঠোপিঠি তিন বোন, ঝগড়া-ঝাটি ছেড়ে মারামারিও একটু-আধটু লেগে যেত। কিন্তু বড় দুই বোন একত্র হয়েও ছোটর সঙ্গে পেরে উঠত না। ফলে কালী পেত্নী বলে গাল দিয়ে ভ্যা করে কেঁদে ফেলত দুজনেই। মা এসে ওই ছোটকেই সব থেকে বেশি শাসন করতেন, চুলের ঝুঁটি টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাইতেন। আর একটু বড় হবার পর মা গায়ে অত হাত তুলতেন না, মুখে গালাগাল দিতেন, তোর বাইরেটা যেমন ভেতরটাও তেমনি– কোনদিকে যদি তাকানো যেত!

ছোটকে নিয়ে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা দিনে দিনে বাড়তেই থাকল। পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে, লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে হাসাহাসি করে কোমর বেঁধে। ঝগড়াও করে। চৌদ্দ ছাড়িয়ে পনেরোয় পা দিল, মারধরের শাসন আর কতদিন চলে? তাছাড়া চেহারা যেমন হোক, ওই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গায়ে একটু মাংস লেগেছে, এক ধরনের ছাঁদছিরি এসেছে। ফ্রক ছেড়ে মা আগেই শাড়ি ধরিয়েছেন ওকে। দেখলে আঠেরোর কম মনে হয় না বয়েস। মেয়ের নিজেরই একটু সমঝে চলা উচিত–তা না ধিঙ্গিপনা!

বাবার টাকার জোর কম। বে-সরকারী আপিসের সুপারিনটেনডেন্ট হয়েছেন। –তাও বেশি বয়সে। ভবিষ্যৎ ভেবেই মেয়েদের ভালো করে লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছে ছিল। রমলা আর শ্যামলীর বিয়ে হয়ে গেল বি,

এ, পাশ করার আগেই। কিন্তু বাবা মায়ের সে জন্য একটুও খেদ নেই। কুড়ি না পেরুতে রমলার অবিশ্বাস্য ভালো বিয়ে হয়েছে। শিক্ষিত সুপুরুষ ছেলে, বাপ আর কাকার হার্ড-অ্যায়ারের ব্যবসা নিজেদের বাড়ি, গাড়ি। ছেলের বাপ আর কাকা সেধে সম্বন্ধ নিয়ে এলেন একদিন। দাবি-দাওয়ার প্রশ্ন নেই। আগে থাকতে খবর দিয়ে মেয়ে দেখতে এলেন, দেখে দিন। তারিখ ঠিক করার তাগিদ দিয়ে গেলেন।

ব্যাপার দেখে মেয়েদের বাবা-মা ভেবাচাকা। তাই দেখে আড়াল থেকে শ্যামলী আর কাজল মিটিমিটি হাসে। রমলা ওদের চোখ পাকিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ খবরদার, বাবা-মাকে কিছু বলবি না!

কিছু না বললেও তাঁরা আঁচ করে নিলেন। শ্যামলী আর কাজল ছমাস আগে থেকেই বাবা-মায়ের মুখে এই হাসি দেখার প্রত্যাশায় ছিল। একই প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে আর একই বিল্ডিংয়ের দুই শাখার একদিকে কলেজ, একদিকে স্কুল। বাড়ি এসে এই দুই মেয়েকে দিদি কেন ফিরল না সে-সাফাই অনেক দিন গাইতে হয়েছে বাবা-মায়ের কাছে। বি, এ, পরীক্ষা আসছে, পড়ার চাপ বাড়ছে, দিদি বিনেপয়সায় ছুটির পর প্রোফেসারদের বাড়ি পড়তে যায়, কখনো বা স্পেশাল টিউটোরিয়ালের জন্য কলেজেই আটকে যায়, ইত্যাদি। মেয়ে কলেজ, মেয়ে প্রফেসার, অতএব বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। বড় মেয়ের হঠাৎ পড়াশুনার একাগ্রতা দেখে মনে মনে বরং খুশিই। তাঁরা। সেই মেয়ে বিয়ের পরেই কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক হেঁটে দিল সেটাই বিস্ময়। মা বলেছিলেন এত পড়াশুনা করলি, এত কষ্ট করলি, পরীক্ষাটা দিয়েই ফেল না!

রমলা বলেছে, ভালো লাগে না।

বড় মেয়ের ভালো লাগা-না-লাগাটা বাবা-মা এখন আর ছোট করে দেখেন না। মা বলেন থাক তা হলে।

কাজল একটু ঝামটা মেরে বলে বসেছিল, কষ্টের ফল তো পেয়েই গেছে, আবার কেন!

শ্যামলী সশঙ্ক দৃষ্টিতে ভেঁপো বোনের দিকে তাকিয়েছে। সে ইদানীং দিদিকে বেশ একটু তোয়াজ তোষামোদ করে। রমলা ছোটর কাছেও তা-ই আশা করে। আড়ালে টেনে এনে কাজলকে শাসিয়েছে, তোর বড় বাড় বেড়েছে, না?

কাজলেরও তেমনি জবাব, যা যা, ওই ছোড়দি তোকে পটে বসিয়ে হাতজোড় করে থাকবেখন, আমাকে চোখ দেখাতে আসিস না!

চার মাস না যেতে কাজল মায়ের কাছে আর একটা বোস উক্তি করে ফেলেছিল। বলেছিল, ছোড়দিরও শিগগিরই খুব ভালো বিয়ে হয়ে যাবে দেখো!

মায়ের মনে সংশয়, চোখে ভয়।-তুই কি করে জানলি?

–দেখে নিও। কাজল আর বিস্তারের ধার ধারে না।

সেই বিকেলেই শ্যামলী একেবারে আগুন ওর ওপর।-মাকে বলতে গেলি, তোর লজ্জা করে না, হিংসুটে কোথাকার! ভিতরটাও হিংসেয় একেবারে কালি হয়ে আছে, কেমন?

কাজল পাল্টা রুখে উঠেছে, আছেই তো। বেশ করেছি বলেছি–আমি বাইরে কালো, ভিতরে কালো, আমার সব কালো। তুই তোর ভদ্রলোককে রূপ ধুয়ে জল খাওয়াগে যা।

আরো মাসকয়েক যেতেই ছোট মেয়ের উক্তির সার বুঝতে কষ্ট হয়নি মায়ের। রমলা প্রায়ই শ্যামলীকে নিজের বাড়িতে ধরে নিয়ে যায়। ছুটি থাকলে দুই-এক দিন আটকেও রাখে। ছোট বোনের চেহারা যেমনই হোক, তাকে অবজ্ঞা করতে দেখে। মায়ের মনে লাগত। কিন্তু বড় মেয়ের আসল উদ্দেশ্যটা বোঝা গেল যখন মাঝে। মাঝে ওর খুড়শ্বশুরের ছেলের এ-বাড়িতে পদার্পণ ঘটতে লাগল। শ্বশুর আর খুড় শ্বশুরের যুক্ত ব্যবসা, তবে একান্নবর্তী পরিবার নয়। জামাই বিমানের মতো, রঞ্জনও ওই ব্যবসার পদস্থ লোক একজন। সেও সুশ্রী, শিক্ষিত-বিমানের থেকে আট-নমাসের

রমলার কাছে সৌভাগ্যের আভাস পেয়ে আশায় আনন্দে মুখে কথা সরে না। মায়ের। মনে মনে বড় মেয়ের বুদ্ধির কত যে প্রশংসা করেছেন তারপর ঠিক নেই।

না, আশা এবং আনন্দ ব্যর্থ হয়নি মায়ের। রঞ্জনের সঙ্গে শ্যামলীরও নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেছে। আনন্দের হাট একেবারে।

তিন মাস না যেতে মা এবার দুই কৃতী জামাইকেই মুরুব্বি ধরেছেন। ছোটর জন্য এবারে একটা ভালো ছেলে দেখে দাও বাবারা–চেহারা যেমনই হোক, তোমরা থাকতে ওর বিয়ে হবে না?

কাজল মায়ের ওপর রাগে জ্বলছে। বিমান আর রঞ্জন দুজনেই শাশুড়ীকে আশ্বাস দিয়েছে–বিয়ে হবে না কেন, সবে তো হায়ার সেকেণ্ডারি দিল–এত ব্যস্ত হচ্ছেন। কেন?

শাশুড়ী আড়াল হতেই প্রায় সমবয়সী খুড়তুতো-জাঠতুতো দুই ভাই কাজলের পিছনে লেগেছে। বিমান বলে, হারে রমা, আর তো হাতের মুঠোয় ভাই-টাই নেই আমাদের–এটাকে আমরাই ভাগাভাগি করে নিয়ে নিই, কি বলিস?

রঞ্জন সায় দেয়, আপত্তি কি, মা যে কেন ওর চেহারার খোঁটা দেন বুঝি না–আমার তো বেশ লাগে।

কাজল ভেঙচি কেটে চেঁচিয়ে জবাব দেয়, নিজের নিজের বউকে শো কেস-এ সাজিয়ে রেখে দেখে দেখে চোখ জুড়োও গে যাও না–আমার পিছনে কেন!

এমন গলা ছেড়ে এই গোছের কথা বলে যে দু ভাই-ই চুপ করে যায়। দুবোন ভ্রূকুটি করে তাকায় ছোট বোনের দিকে। ওকে আড়ালে ডেকে ধমকায়, তোকে পছন্দ করে বলেই ও-রকম ঠাট্টা করে, তা বলে তুই যা মুখে আসে তাই বলবি! বাড়িতে সক্কলে কত সমীহ করে ওদের, জানিস?

-তোরা যে যার পাদোদক ধুয়ে জল খা গে যা, আমার পিছনে লাগতে আসে কেন?

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে কাজল অনেক সময় অবাক হয়েছে। বিয়ের আগে পর্যন্ত যে দুভাই হ্যাংলার মতো দিদিদের পিছনে ঘুরেছে, কলেজে এসে হাজির হয়েছে বেহায়ার মতো, চোরের মত লুকিয়ে সিনেমায় নিয়ে গেছে–বিয়ের কিছুদিন না যেতে সেই মানুষদের ভিন্ন মূর্তি-রাশভারী হোমরা-চোমরা মানুষের মতো হাব-ভাব। দিদির না হয় দেড় বছর হতে চলল বিয়ে হয়েছে, বিমানদার মনমেজাজ বুঝে চলে, কিন্তু ছোড়দির তো বিয়ে পাঁচ মাসও হয়নি, এরই মধ্যে রঞ্জনদার কথায় ওঠে বসে, তোয়াজ করে চলে তাকে–আর সর্বদাই ভয়, এই বুঝি বকুনি খেতে হল।

যাক, কাজলকে নিয়েই এ বাড়ির যা-কিছু অশান্তির সূত্রপাত। দুদুটো মেয়ের অত ভালো বিয়ে হওয়ায় বাবা-মায়ের ওর জন্য আরো বেশি দুশ্চিন্তা। কিন্তু আচার আচরণে মেয়ে যেন আক্রোশবশতই তাদের দুশ্চিন্তা আরো বাড়িয়ে চলেছে।

…একদিন দুপুরে বাপেরবাড়ি আসার সময় রমলা দেখে মোড়ের ও-ধারে একটা বাবরি-চুল লোকের সঙ্গে কাজল হেসে হেসে কথা কইছে। লোকটাকে এরা সকলেই চেনে। নাম সনৎ ঘোষ, সকলে সোনা ঘোষ বলে ডাকে। কোন এক অ্যামেচার ক্লাবের হয়ে থিয়েটার করে বেড়ায়। সেই থিয়েটারও রমলারা দুই-একটা দেখেছে। টাইপ রোল-এ মন্দ করে না অবশ্য, কিন্তু রমলারা দুচক্ষে দেখতে পারে না ওকে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকত–আর হরদম বিড়ি টানত।

সিনেমা থিয়েটার দেখার ব্যাপারে তিন বোনের মধ্যে কাজলেরই নেশা বেশি। তা বলে এরকম একটা লোকের সঙ্গে তার বোন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলবে, হাসাহাসি করবে!

পিত্তি জ্বলে গেল. রমলার। এসেই মাকে নিয়ে পড়ল। ড্রাইভারও নাকি দেখেছে। আর তাইতে লজ্জায় আরো বেশি মাথা কাটা গেছে রমলার।

মায়ের বুকে ত্রাস। বললেন, ও আমাদের মুখ পুড়িয়ে ছাড়বে, তোরা কিছু বল

কাজল বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চিৎকার চেঁচামেচি, বকাবকি। কাজল ব্যাপারখানা বুঝে নিল। সরোষে একবার দিদির দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। কিন্তু রমলা ছাড়বার পাত্র নয়। ঘরে ধাওয়া করল। বি, এ, পড়ছিস আর এই রুচি তোর, অ্যাঁ? এ-রকম একটা থার্ডক্লাস লোকের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলিস, হাসাহাসি করিস?

কাজল গম্ভীর শ্লেষে জবাব দিল, তোদের মতো ফার্স্টক্লাস লোক আর কোথায় পাব ব–আমার জুটলে থার্ডক্লাসই জুটবে!

রমলা ঝলসে উঠল, লজ্জাও করে না মুখ নেড়ে কথা বলতে! তোর জামাইবাবু যদি কোন দিন এই কাণ্ড দেখে, কক্ষণো কোথাও তোর জন্যে চেষ্টা করতে রাজি হবে?

সঙ্গে সঙ্গে কাজলের ধৈর্য গেল। পাল্টা ঝাজে বলে উঠল, তুই আর তোর বরও এই কাণ্ড করে উতরে গেছিসতোদের বেলায় দোষ নেই কেন? গায়ের চামড়া সাদা বলে আর বিমানদার টাকা আছে বলে?

রমলা চিৎকার করে উঠেছে, মা–কাজল আমাকে অপমান করছে, আমি আর এ বাড়িতে আসব না বলে দিলাম কিন্তু!

মা আঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন, আর তারপর যা মুখে আসে তাই বলে কাজলকে আর একপ্রস্থ গালাগালি।

মাসখানেকের মধ্যে এর থেকে দ্বিগুণ হুলুস্থুল বাড়িতে। ছুটির দিনে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে বিমান আর রঞ্জন সস্ত্রীক সিনেমা দেখতে গেছল। হাফটাইমের আলো জ্বলতে রঞ্জনের চোখে পড়ল, সামনের সস্তার টিকিটের সারিতে একটা লোকের পাশে বসে আছে কাজল। দুজনে হাসছে, গল্প করছে। গায়ে খোঁচা মেরে শ্যামলীকে দেখালো রঞ্জন, শ্যামলী

দিদির গা-টিপে সামনের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ফলে বিমানেরও দেখতে বাকি থাকল না।

চারজনেই সারাক্ষণ গম্ভীর তারপর। রমলা আর শ্যামলীর ছবি দেখা মাথায় উঠল। সোনী ঘোষকে ওরা দুজনেই চেনে। কিন্তু বিমান আর রঞ্জন জিজ্ঞাসা করতে দুজনেই মাথা নেড়েছে–চেনে না।

শো ভাঙার পর বিমান আর রঞ্জনের ছোট শালীর জন্য অপেক্ষা করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু রমলা আর শ্যামলীর এত মাথা ধরেছে যে তারা আর এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারছে না। ব্যাপার বুঝেই দুভাই আর গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করল না। বাড়ি ফিরে। ছোট শালীকে নিয়ে গম্ভীর টিকাটিপ্পনী শুরু করল।

রাত্রিতে একসঙ্গে দুবোনই বাপেরবাড়ি এসে হাজির। বাবাও বাড়িতে তখন। সমাচার শুনে বাবা-মায়ের মাথায় বজ্রাঘাত। তার ওপর রমলা শ্যামলী স্পষ্ট জানিয়ে দিল, এ রকম বিচ্ছিরি ব্যাপার হতে থাকলে তাদের আর বাপেরবাড়ি আসতেই দেবে না।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে পায়ের থেকে চটি খুলে ছোট মেয়েকে মারতে গেছলেন। বাবা। মেয়েরাই অবশ্য আটকেছে। আর মা আঁশবটি দিয়ে কুটতে চেয়েছেন তাকে। ঘেন্নায় ওই আঁস্তাকুড়-মার্কা মুখে থুথু ছিটোতে চেয়েছেন।

বিমান আর রঞ্জন বাড়ি এলে কাজল এরপর নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করেছে। তারা ডাকা সত্ত্বেও আসেনি। দিদিরা তার ফলেও ভয়ানক অপমান বোধ করেছে।

বাপেরবাড়ির এই অশান্তির সংসারে দুর্দিন ঘনালো হঠাৎ। বলা নেই, কওয়া নেই, হার্ট-অ্যাটাকে মা হঠাৎ চোখ বুজলেন। বোনেরা তারস্বরে আক্ষেপ করল, কাজলই মা-কে মেরে ফেলল।

পাঁচ মাস না যেতে বাবাও গাড়িচাপা পড়ে মায়ের পথ ধরলেন। বড় দুই বোন। এবারেও আছাড়ি-বিছাড়ি করে কাঁদল। সেই একই আক্ষেপ। ছোট

বোনের চিন্তাতেই বাবা অহরহ অন্যমনস্ক থাকতেন। অতএব এই মৃত্যুর জন্যেও সে-ই দায়ী।

শোকের ব্যাপার চুকেবুকে যেতে ওই দিদিদের আশ্রয়েই আসতে হল কাজলকে। কর্তব্যবোধে দিদিরাই টেনে নিয়ে এল অবশ্য। কিছুদিন বড়দি রাখল তাকে, কিছুদিন ছোটদি। ওর অবস্থানের ফলে দুই দিদিই স্বামীদের কাছে সংকুচিত। সর্বদাই চাল-চলন সম্পর্কে উপদেশ দেয় বোনকে। আর মেজাজ বুঝে বোনের বিয়ের চেষ্টার অনুরোধ জানায়।

তারা কখনো চুপ করে থাকে, কখনো বিরক্ত হয়। বলে, সবুর করো, চেষ্টা হচ্ছে, বললেই তো আর বিয়ে হয় না-বোনের রূপ তো জানো!

পাশের ঘর থেকে বিমানদার এই কথা নিজের কানে শুনেছে কাজল। তার ধারণা, রঞ্জনদাও ছোড়দিকে এই কথাই বলে।

দিদির ততদিনে একটি ছেলে হয়েছে, আর ছোটদিরও হব-হব করছে। স্বামীদের তারা আরো অনুগত হয়ে পড়েছে। নির্বাক কাজল বাড়িতে দুজনেরই গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্ব অনুভব করে। কাজলের সঙ্গে তারা যে একেবারে কথা বলে না তা নয়। দুভাই একসঙ্গে হলে ঠাট্টাও করে, আমাদের দুজনের মধ্যে সেই ভাগাভাগিই হল দেখছি

বিমানদা জিজ্ঞাসা করে, পড়াশুনার ইচ্ছে থাকে তো বলো, আবার ব্যবস্থা করে। দিই!

দিদি উষ্ণ ঝুঁজ দেখায়, আর পড়াশুনায় কাজ নেই, বিয়ের চেষ্টা দেখো।

রঞ্জন সকলের সামনেই জ্র-ভঙ্গি করে খুঁটিয়ে দেখে কাজলকে।–তোমরা যা-ই বলো, কাজল দেবীর মধ্যে একটা বলিষ্ঠ ভাব আছে যা তোমাদের নেই ছেলেগুলোর চোখে পড়ে না কেন বুঝি না।

শ্যামলী হেসে বলে, তোমাকে আর চাটুকারিতা করতে হবে না!

www.bengaliebook.com

দুই ভাইয়ের খুব ভাব। তারা একত্র হলেই শুধু এই গোছের একটু-আধটু হাসি-ঠাট্টা হয়।

এরই মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল একদিন। কাজল তখন রমলার কাছে। বাড়ির ঝি এসে জানালো, একটা লোক মাসিমণির খোঁজ করছে।

মাসিমণি অর্থাৎ কাজল। বিমান কাজে বেরোয়নি তখনো। সেও শুনল খবরটা। রমলা আর বিমান দুজনেই দরজার বাইরে এসে দেখল কে লোক। দেখামাত্র রমলা চাপা ঝাজে বলে উঠল, তাড়িয়ে দাও! ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দাও!

অদূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাবরি-চুল সোনা ঘোষ।

কিন্তু তাড়ানো বা ঘাড়ধাক্কা দেওয়ার ফুরসত মিলল না। ওদিকের ঘর থেকে তাকে দেখেই কাজল পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছে। সামনে এসে দাঁড়াল। পাঁচ সাত মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দুজনের কি কথা হল এদিকের কেউ জানল না। রমলা আর বিমান লোকটাকে বিমর্ষ মুখে চলে যেতে দেখল।

বিমান জিজ্ঞাসা করল, কে?

রমলা শুকনো গলায় জবাব দিল, সোনা ঘোষ... বাজে লোক একটা।

–কি করে?

–থিয়েটার।

লোকটা চোখের আড়াল হতেই রাগে গজরাতে গজরাতে বোনের কাছে এলো রমলা।-ও এখানে এসেছে কোন সাহসে? কোন আক্কেলে?

কাজল মুখ তুলে তার দিকে তাকালো শুধু। দিদির পিছনে বিমানদা দাঁড়িয়ে।

দিদি আরো অসহিষ্ণু।–আমি জানতে চাই, ও কেন এসেছে এখানে?

www.bengaliebook.com

কাজল ঠাণ্ডা জবাব দিল, আমাকে দেখতে।

এরকম জবাব পাবে রমলা আশা করেনি। রাগে সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ। কিন্তু সে ফেটে পড়ার আগেই বিমান জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে দেখতে ও কি আরো এখানে এসেছে, না এই প্রথম?–

কাজল নিরুত্তরে তাকাল শুধু। জবাব দিল না।

-দেখো কাজল দেবী, বিমানের গলার স্বর আদৌ উঁচু পর্দায় উঠল না, অথচ কঠিন শোনালো, এ বাড়ির ডিসিপ্লিন আর রীতিনীতি একটু অন্যরকম, সেটা এতদিনে তোমার বোঝার কথা–এটা মনে রেখো।

বিকেলেই ফোন করে শ্যামলীকে আনিয়েছে রমলা। ওদিকে বিমানের মুখে রঞ্জনও খবর শুনছে। আপিসের পর সেও সোজা এখানেই এসেছে। আর তারপর সকলে মিলে কঠিন উপদেশই দিয়েছে কাজলকে।

কাজল নির্বাক। সে-ও তার একটা বাড়তি অপরাধ যেন। আসলে সে যে সোনা ঘোষকে এখানে আসতে সাফ নিষেধ করে দিয়েছে, সেটা জানার কেউ দরকার বোধ করল না।

পরদিন দিবানিদ্রা সম্পন্ন করে রমলা কাজলকে দেখতে পেল না। কোথাও না। শ্যামলীকে ফোন করল। সেও আকাশ থেকে পড়ল, অর্থাৎ তার ওখানেও যায় নি।

দুই-এক দিন নয়, দুই-এক মাস নয়–টানা তিন বছর কেউ আর তার হদিস পেল না।

.

কোনো এক অ্যামেচার ক্লাবের অভিনেত্রী কাজল মিত্রর নাম ছড়াতে লাগল একটু একটু করে। তারপর সে-নাম আর দিদিদের ভগ্নীপতিদের কানেও এলো। তারা সাগ্রহে দুই একটা থিয়েটার দেখে এলো। অভিনয় সকলেরই ভালো লেগেছে, কিন্তু সকলেই গম্ভীর।

www.bengaliebook.com

বোনেরা খবর সংগ্রহে সচেষ্ট হল।... অ্যামেচার ক্লাবের অভিনেত্রী হলেও ভালো রোজগার করে কাজল মিত্র। কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে থেকেও ডাক পড়ে তার।

আরো এক বছরের মধ্যে ওই নামের চটক চারগুণ বেড়ে গেল। সিনেমা থিয়েটারের পত্র-পত্রিকায় তার ছবি আর খবর বেরুতে লাগল। বড় কাগজের কলা বিভাগগুলোতেও। শহরে সব থেকে বড় পেশাদার নাট-মঞ্চ মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দু-বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করেছে তাকে।

সেই দু বছরে তার তিনটে নাটকের সফল অভিনয় খেল দিদি-ভগ্নীপতিরা। মুগ্ধ হবার মতোই অভিনয় বটে। পেন্টিংয়ের ফলে স্টেজে দমতো রূপসী দেখায়। তাকে। মাঝের ঐতিহাসিক এক নাটকে তো রাজেন্দ্রাণীর ভূমিকায় তারই জয়জয়কার। সেই অভিনয় দেখেও দিদিরা হতবাক। হাবভাব চাউনি চলন বলন সবই মিষ্টি অথচ দৃপ্ত রাজেন্দ্রাণীর মতোই।

তৃতীয় বছরের শেষেই পত্র-পত্রিকার বিমর্ষ খবর, প্রতিভাসম্পন্না অভিনেত্রী কাজল মিত্রকে পেশাদার নাটমঞ্চ আর চুক্তিবদ্ধ রাখতে সক্ষম হলেন না। অচিরে নিজেই তিনি একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান চালু করবেন। ইতিমধ্যে চিত্রজগতের দুজন খ্যাতিমান। পরিচালক তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দুটি বড় ছবিতে কে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে। তবে আশার কথা, কাগজের প্রতিনিধিদের তিনি বলেছেন, রঙ্গমঞ্চই তার প্রাণ, এটি তিনি ছাড়বেন না, ছায়াচিত্রের কাজটাই বরং সাময়িক।

ছোট বড় সব কাগজেই চিত্র এবং নাটমঞ্চের পাতায় কাজল মিত্রর ছবির ছড়াছড়ি। কাজল মিত্র গাড়ি ড্রাইভ করছেন। নীল চশমা পরে-কাগজে এমন ছবিও বেরিয়েছে। আর কাজল মিত্রর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান চালু হবার সংবাদও।

আর নিস্পৃহ থাকা সম্ভব হল না দুই বোনের। পরামর্শ করে এক দুপুরে বাড়ির গাড়ি না নিয়ে ট্যাকসিতে চেপে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। সিনেমার কাগজে বাড়ির ঠিকানার হদিস মিলেছে–কিন্তু গাইড হাতড়ে ফোননম্বর পায়নি। অতএব কপাল ঠুকে রওনা হয়েছে।

শহর থেকে অনেক দূরে ছোট একটা ছিমছাম একতলা বাড়ি। সামনে ছোট একটু বাগান।

কড়া নাড়তে কাজলই দরজা খুলে দিল। তারপর দুই চক্ষু বিস্ফারিত। মুখে কথা সরে না খানিক।–কি ভাগ্যি কি ভাগ্যি–তোরা! আঁ, আমি জেগে আছি না ঘুমুচ্ছি? আয় আয় আয়

খুশিতে আটখানা একেবারে। আদর করে তাদের টেনে এনে বসালো। তারপর লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিল একেবারে।

গোড়ায় খানিক দুই বোনেরই বিব্রত মুখ। তারপর রমলা বলল, আর বেশি খাতির দেখাস না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনটে বছর-সোজা ভাবিয়েছিস?

কাজল হাসল একচোট। তারপর বলল, তিন বছর পরে তো আরো তিনটে বছর কেটে গেল, তার মধ্যে তো একটা-বার খবর নিতে এলি না!

শ্যামলী বলল, আমাদের আসা কি সহজ কথা নাকি, কোন রাজ্যের পারে এসে আছিস–তাছাড়া সেদিন মাত্র তো তোর ঠিকানা জানলাম।

কাজল হাসছে তাদের দিকে চেয়ে। ঝকঝকে দাঁতের একটু একটু দেখা যাচ্ছে। এমনিই নিঃশব্দ অথচ জীবন্ত হাসি রাজেন্দ্রাণীর ভূমিকায় নাটকেও দেখেছিল দুই বোনের মনে পড়ল। আর মনে হল মেয়েটার সেই চেহারা সেই রং সেই নাক মুখ চোখই আছে–কিন্তু তার মধ্যেই কেমন একটু শ্রী এসেছে বেশ যা চোখে পড়েই।

ফুর্তিতে কাজল নিজের হাতে চা বানালো, খাবার এনে সামনে রাখল, আর গল্প করতে লাগল। কিন্তু দিদিরা অন্য গল্প ছেড়ে শুধু সিনেমা আর থিয়েটার রাজ্যের গল্প শুনতে চায়। কাজলের ওই গল্পে আবার উৎসাহ কম, জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয়।

অনেকক্ষণ বাদে ওর সিথির দিকে চোখ গেল রমলার। বলল, বিয়ে-থা করলি না এখনো, আর কবে করবি! বয়েস তো সাতাশ গড়ালো!

কাজল হাসিমুখে সোজা উত্তর দিল, বিয়ে করেছি বলতে পারিস, আবার করিওনি বলতে পারিস। তবে পাকা অনুষ্ঠান এবারে একটা শিগগিরই সেরে ফেলব ভাবছি...নেমন্তন্ন করলে আসবি?

আগেরটুকু শুনে রমলা আর শ্যামলীর মুখ লাল। কিন্তু জবাব দেবার আগেই বাইরে থেকে আর একজনের পদার্পণ ঘটল। সেই বাবরি-চুল সোনা ঘোষ, পরনে সেই রকমই পাজামা আর টুইলের শার্ট তবে একটু মোটার দিকে ঘেঁষেছে। ওকে দেখে বোনেরা সচকিত।

সোনা ঘোষ থমকালো একটু। তারপর একগাল হেসে বলল, দিদিরা যে! খবর ভালো?

রমলা আর শ্যামলী চুপ।

সোনা ঘোষ কাজলের দিকে ফিরল।–জলপাইগুড়ির সেই পার্টি ঠায় আপিসে বসে আছে, কন্ট্রাকট সই না করে নড়বেই না।

কাজল ভুরু কুঁচকে ভাবল একটু।–কবে নিতে চায়?

–এই মাসে হলেই সুবিধে হতো বলছে।

–উঁহু, এ মাসে হবে না, শুটিং আছে–সামনের মাসে গোড়ার দিকে হতে পারে। সব খরচখরচা বাদ দিয়ে চার হাজার টাকা দিতে রাজি থাকে তো কন্ট্রাকট সই করে। দাও।

দিদিদের দিকে আর একবার কৌতুক-মাখা চোখ বুলিয়ে সোনা ঘোষ চলে গেল। কাজল আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, ভগ্নীপতি পছন্দ হল তোদের?

ওরা দুজনেই আঁতকে উঠল একেবারে। রমলা বলেই ফেলল, ওই লোফারটাকেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবি তুই!

কাজল হাসছে। বলল, লোফারই বটে... গোড়ায় গোড়ায় অভিনয় রপ্ত করতে না পারলে চড়চাপড় পর্যন্ত বসিয়ে দিত, বুঝলি?

রাগত মুখে শ্যামলী বলল, তোর রুচি আর বদলালো না।

কাজল হাসছে।–যা বলেছিস, আর এত টাকাপয়সা নাড়াচাড়া করছে তবু রুচি ওই লোফারেরও বদলালো না!...অথচ কতই তো দেখছি, কত রকমের প্রস্তাব নিয়ে কত লোক আসছে–আর কত উদার সব! ভালো কথা, নিজস্ব প্রতিষ্ঠান করব খবরটা কাগজে বেরুবার পর চেকবই পকেটে করে বিমানদা আর রঞ্জনদাও ছোটাছুটি করে এসেছিল। কাজল হাসছে।– আলাদা আলাদা অবশ্য–টাকার দরকার নেই বোঝার পরেও আসার কামাই নেই–হাজার হেক, শালী তো–টান যাবে কোথায়! শেষে এত বেশি আসতে লাগল যে তোদের কথা ভেবে আমিই একদিন নিষেধ করে দিলাম–তোরা ফিরে গিয়ে বেচারাদের ওপর আবার রাগারাগি করিস না!

কাজল হাসছে। সেই সামান্য দাঁত-চিকানো নিঃশব্দ হাসি। এখন মেক-আপ নেই, পেন্ট নেই, তবু ওই মুখ ওই চাউনি আর ওই হাসি রাজেন্দ্রাণীর মতোই লাগছে।

রক্তশূন্য পাংশু বিবর্ণ মুখে মেলা ও শ্যামলী যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েও সেইটুকু দেখে নিচ্ছে।